স্বামী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

কামিনী প্রকাশালয়

১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন

কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রকাশক :
শ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
মাঘ—১৩৫৯

প্রচ্ছদ :
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

সৌদামিনী নামটা আমার বাবার দেওয়া। আমি প্রায়ই ভাবি, আমাকে এক বছরের বেশী ত তিনি চোখে দেখে যেতে পাননি, তবে এমন করে আমার ভিতরে বাহিরে মিলিয়ে নাম রেখে গিয়েছিলেন কি করে? বীজমন্ত্রের মত এই একটি কথায় আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ-জীবনের ইতিহাসটাই যেন বাবা ব্যক্ত করে গেছেন।

রূপ? তা আছে মানি; কিন্তু না গো না, এ আমার দেমাক নয়, দেমাক নয়। বুক চিরে দেখান যায় না, নইলে এই মুহূর্তেই দেখিয়ে দিতুম, রূপ নিয়ে গৌরব করবার আমার আর বাকি কিছু নেই, একেবারে—কিছু নেই। আঠারো, উনিশ? হ্যাঁ, তাই বটে। বয়স আমার উনিশই। বাইরের দেহটা আমার তার বেশী প্রাচীন হতে পায়নি। কিন্তু এই বুকের ভিতরটায়? এখানে যে বুড়ী তার উনআশি বছরের শুকনো হাড়-গোড় নিয়ে বাস করে আছে, তাকে দেখতে পাচ্ছ না? পেলে এতক্ষণ ভয়ে আঁৎকে উঠতে।

একলা ঘরের মধ্যে মনে হলেও ত আজও আমার লজ্জায় মরতে ইচ্ছা করে; তবে এ কলঙ্কের কালি কাগজের উপর ঢেলে দেবার আমার কি আবশ্যক ছিল! সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে সেইটাই ত আজ আমাকে বলতে হবে। নইলে আমার মুক্তি হবে কিসে?

সব মেয়ের মত আমিও ত আমার স্বামীকে বিয়ের মন্তরের ভিতর দিয়েই পেয়েছিলুম। তবু কেন তাতে আমার মন উঠল না। তাই যে দামটা আমাকে দিতে হ'ল, আমার অতি-বড় শত্রুর জন্যেও তা একদিনের জন্যেও কামনা করিনে। কিন্তু দাম আমাকে দিতে হ'ল। যিনি সমস্ত পাপ-পুণ্য, লাভ-ক্ষতি, ন্যায়-অন্যায়ের মালিক, তিনি আমাকে একবিন্দু রেহাই দিলেন না। কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় করে সর্বস্বান্ত করে যখন আমাকে পথে বার করে দিলেন, লজ্জাশরমের আর যখন কোথাও কিছু অবশিষ্ট রাখলেন না, তখনই শুধু দেখিয়ে দিলেন, ওরে সর্বনাশী, এ তুই করেছিস কি? স্বামী যে তোর আত্মা। তাঁকে ছেড়ে তুই যাবি কোথায়? একদিন না একদিন তোর ঐ শূন্য বুকের মধ্যে তাকে যে তোর পেতেই হবে। এ জন্মে হোক, আগামী

জন্মে হোক, কোটি জন্ম পরে হোক, তাঁকে যে তোর চাই-ই। তুই যে তাঁরই।

জানি, যা হারিয়েছি তার অনন্ত গুণ আজ ফিরে পেয়েছি। কিন্তু তবু যে এ কথা কিছুতেই ভুলতে পারিনে, এটা আমার নারী-দেহ। আজ আমার আনন্দ রাখবারও জায়গা নেই, কিন্তু ব্যথা রাখবারও যে ঠাঁই দেখি না প্রভু। এ দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু যে অহোরাত্র কাঁদচে—ওরে অস্পৃশ্যা, ওরে পতিতা, আমাদের আর বেঁধে পোড়াস নে, আমাদের ছুটি দে, আমরা একবার মরে বাঁচি।

কিন্তু যাক সে কথা।

বাবা মারা গেলেন, এক বছরের মেয়ে নিয়ে মা বাপের বাড়ি চলে এলেন। মামার ছেলেপিলে ছিল না, তাই গরীবের ঘর হলেও আমার আদর-যত্নের কোন ক্রুটি হ'ল না ; বড় বয়স পর্যন্ত তাঁর কাছে বসে ইংরাজী বাংলা কত বই না আমি পড়েছিলুম।

কিন্তু মামা ছিলেন ঘোর নাস্তিক। ঠাকুর-দেবতা কিছুই মানতেন না। বাড়িতে একটা পূজা অর্চনা কি বারব্রতও কোনদিন হতে দেখিনি, এ সব তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না।

নাস্তিক বৈ কি ? মামা মুখে বলতেন বটে তিনি Agnostic কিন্তু, সেও ত একটা মস্ত ফাঁকি ! কথাটা যিনি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি ত শুধু লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যই নিজেদের আগাগোড়া ফাঁকির পিছনে আর একটা আকাশ-পাতাল-জোড়া ফাঁকি জুড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তখন কি ছাই এ সব বুঝেছিলুম ! আসল কথা হচ্চে, সূয্যির চেয়ে বালির তাতেই গায়ে বেশী ফোস্কা পড়ে। আমার মামারও হয়েছিল ঠিক সেই দশা।

শুধু আমার মামা বোধ করি যেন লুকিয়ে বসে কি-সব করতেন। সে কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ জানতে পেত না। তা মা যা খুশি করুন, আমি কিন্তু মামার বিদ্যে ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা শিখে নিয়েছিলুম।

আমার বেশ মনে পড়ে, দোরগোড়ায় সাধু-সন্ন্যাসীরা এসে দাঁড়ালে সঙ দেখবার জন্যে ছুটে গিয়ে মামাকে ডেকে আনতুম। তিনি তাদের সঙ্গে এমনি ঠাট্টা শুরু করে দিতেন যে, বেচারারা পালাবার পথ পেত না। আমি হেসে হাততালি দিয়ে গড়িয়ে লুটিয়ে পড়তুম। এমনি করেই আমাদের দিন

কাটছিল।

শুধু মা এক-একদিন ভারী গোল বাধাতেন। মুখ ভারী করে এসে বলতেন, দাদা, সতুর ত দিন দিন বয়স হচ্চে, এখন থেকে একটু খোঁজাখুঁজি না করলে সময়ে বিয়ে দেবে কি করে।

মামা আশ্চর্য হয়ে বলতেন, বলিস কি গিরি, তোর মেয়ে ত এখনো বারো পেরোয় নি, এর মধ্যেই তোর—সাহেবদের মেয়েরা ত এ বয়সে—

মা কাঁদ-কাঁদ গলায় জবাব দিতেন, সাহেবদের কথা কেন তুলচ দাদা, আমরা ত সত্যি সাহেব নই! ঠাকুর-দেবতা না মানো, তাঁরা কিছু আর ঝগড়া করতে আসচেন না, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের সমাজ ত আছে? তাকে উড়িয়ে দেবে কি করে?

মামা হেসে বলতেন, ভাবিস নে বোন, সে-সব আমি জানি। এই যেমন তোকে হেসে উড়িয়ে দিচ্চি, ঠিক এমনি করে আমাদের নচ্ছার সমাজটাকেও হেসে উড়িয়ে দেব।

মা মুখ ভার করে বিড়বিড় করে বকতে বকতে উঠে যেতেন। মামা গ্রাহ্য করতেন না বটে, কিন্তু আমার ভারী ভয় হ'ত। কেমন করে যেন বুঝতে পারতুম, মামা যাই বলুন, মার কাছ থেকে আমাকে তিনি রক্ষা করতে পারবেন না।

কেন যে বিয়ের কথায় ভয় হতে শুরু হয়েছিল, তা বলচি। আমাদের পশ্চিম-পাড়ার বুক চিরে যে নালাটা গ্রামের সমস্ত বর্ষার জল নদীতে ঢেলে দিত, তার দু'পাড়ে যে দু'ঘরের বাস ছিল, তার এক ঘর আমরা, অন্য ঘর গ্রামের জমিদার বিপিন মজুমদার। এই মজুমদার বংশ যেমন ধনী তেমনি দুর্দান্ত। গাঁয়ের ভেতরে-বাইরে এদের প্রতাপের সীমা ছিল না। নরেন ছিল এই বংশের একমাত্র বংশধর।

আজ এতবড় মিথ্যেটা মুখে আনতে আমার যে কি হচ্চে, সে আমার অন্তর্যামী ছাড়া আর কে জানবে বল, কিন্তু তখন ভেবেছিলুম, এ বুঝি সত্যি একটা জিনিস—সত্যিই বুঝি নরেনকে ভালবাসি।

কবে যে এই মোহটা প্রথম জন্মেছিল, সে আমি বলতে পারি না। কলকাতায় সে বি. এ. পড়ত, কিন্তু ছুটির সময় বাড়ি এলে মামার সঙ্গে ফিলজফি আলোচনা করতে প্রায়ই আসত। তখনকার দিনে Agnosticism-ই ছিল বোধ করি লেখাপড়া-জানাদের ফ্যাশন। এই নিয়েই বেশিরভাগ

তর্ক হত। কতদিন মামা তাঁর গৌরব দেখাবার জন্য নরেনবাবুর তর্কের জবাব দিতে আমাকে ডেকে পাঠাতেন। কতদিন সন্ধ্যা ছাড়িয়ে রাত্রি হয়ে যেত, দু'জনের তর্কের কোন মীমাংসা হতো না। কিন্তু আমি প্রায় জিততুম, তার কারণও আজ আর আমার অবিদিত নেই।

মাঝে মাঝে সে হঠাৎ তর্কের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়ে মামার মুখপানে চেয়ে গভীর বিস্ময়ে বলে উঠত, আচ্ছা ব্রজবাবু, এই বয়সে এত বড় লজিকের জ্ঞান, তর্ক করবার এমন একটা আশ্চর্য ক্ষমতা কি আপনি একটা ফিনোমিনন বলে মনে করেন না?

আমি গর্বে, সৌভাগ্যে ঘাড় হেঁট করতুম। ওরে হতভাগী। সেদিন ঘাড়টা তোর চিরকালের মতো একেবারে ভেঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েনি কেন?

মামা উচ্চ-অঙ্গের একটু হাস্য করে বলতেন, কি জান নরেন, এ শুধু শেখাবার ক্যাপাসিটি।

কিন্তু তর্কাতর্কি আমার তত ভাল লাগত না, যত ভাল লাগত তার মুখের মন্টিক্রিস্টোর গল্প। কিন্তু গল্পও আর শেষ হতে চায় না, আমার অধৈর্যেরও আর সীমা পাওয়া যায় না। সকালে ঘুম ভেঙ্গে পর্যন্ত সারাদিন একশ'বার মনে করতুম, কখন বেলা পড়বে, কখন নরেনবাবু আসবে।

এমনি তর্ক করে আর গল্প শুনে আমার বিয়ের বয়স বারো ছাড়িয়ে তেরোর শেষে গড়িয়ে গেল, কিন্তু বিয়ে আমার হ'ল না।

তখন বর্ষার নবযৌবনের দিনে মজুমদারদের বাগানের একটা মস্ত বকুলগাছের তলা ঝরা ফুলে ফুলে একেবারে বোঝাই হয়ে যেত। আমাদের বাগানের ধারের সেই নালাটা পার হয়ে আমি রোজ গিয়ে কুড়িয়ে আনতুম। সেদিন বিকালেও, মাথার উপর গাঢ় মেঘ উপেক্ষা করেই দ্রুতপদে যাচ্ছি, মা দেখতে পেয়ে বললেন, ওলো, ছুটে তো যাচ্ছিস, জল যে এল বলে!

আমি বললুম, জল এখন আসবে না মা, ছুটে গিয়ে দুটো কুড়িয়ে আনি।

মা বললেন, পনেরো মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি নামবে সন্ধ্যা, কথা শোন্—যাসনে। এই অবেলায় ভিজে গেলে ঐ চুলের বোঝা আর শুকোবে না তা বলে দিচ্ছি।

আমি বললুম, তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা, যাই। বৃষ্টি এসে পড়লে মালীদের এই চালাটার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াব। বলতে বলতে ছুটে পালিয়ে গেলুম। মায়ের আমি একটি মেয়ে, দুঃখ দিতে আমাকে কিছুতেই পারতেন না। ছেলেবেলা থেকেই ফুল যে কত ভালবাসি, সে ত তিনি নিজেও

জানতেন, তাই চুপ করে রইলেন, কতদিন ভাবি, সেদিন যদি হতভাগীর চুলের মুঠি ধরে টেনে আনতে মা, এমন করে হয়ত তোমার মুখ পোড়াতুম না।

বকুল ফুলে কোঁচড় প্রায় ভর্তি হয়ে এসেছে, এমন সময় মা যা বললেন, তাই হ'ল। ঝমঝম করে বৃষ্টি এল। ছুটে গিয়ে মালীদের চালার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। কেউ নেই, খুঁটি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মেঘের পানে চেয়ে ভাবচি, ঝমঝম করে ছুটে এসে কে ঢুকে পড়ল। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখি—ওমা! এ যে নরেনবাবু! কলকাতা থেকে তিনি যে বাড়ি এসেছেন, কৈ, সে ত আমি শুনিনি।

আমাকে দেখে চমকে উঠে বললেন, অ্যাঁ, সদু যে! এখানে?

অনেকদিন তাঁকে দেখিনি, অনেকদিন তাঁর গলা শুনিনি, আমার বুকের মধ্যে যেন আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। কান পর্যন্ত লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠল, মুখের পানে চেয়ে ত জবাব দিতে পারলুম না. মাটির দিকে চেয়ে বললুম, আমি ত রোজই ফুল কুড়ুতে আসি। কবে এলেন?

নরেন মালীদের একটা ভাঙ্গা খাটিয়া টেনে নিয়ে বসে বললে, আজ সকালে। কিন্তু তুমি কার হুকুমে ফুল চুরি কর শুনি?

গম্ভীর গলায় আশ্চর্য হয়ে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, চোখ দুটো তার চাপা হাসিতে নাচচে।

লজ্জা! লজ্জা! এই পোড়ার মুখেও কোথা থেকে হাসি এসে পড়ল, বললুম, তাই বৈ কি! কষ্ট করে কুড়িয়ে নিলে বুঝি চুরি করা হয়?

নরেন ফস্ করে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আর আমি যদি ঐ কুড়ান ফুলগুলো তোমার কোঁচড়ের ভেতর থেকে আর একবার কুড়িয়ে নিই, তাকে কি বলে?

জানিনে, কেন আমার ভয় হ'ল, সত্যিই যেন এইবার সে এসে আমার আঁচল চেপে ধরবে। হাতের মুঠো আমার আলগা হয়ে গিয়ে চোখের পলকে সমস্ত ফুল ঝপ করে মাটিতে পড়ে গেল।

ও কি করলে?

আমি কোনমতে আপনাকে সামলে নিয়ে বললুম,আপনাদেরই ত ফুল, বেশ ত, নিন না কুড়িয়ে।

এঁ্যা! এত অভিমান! বলে সে উঠে এসে আমার আঁচলটা টেনে নিয়ে ফুল কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখতে লাগল। কেন জানিনে, হঠাৎ আমার দু'চোখ জলে ভরে গেল, আমি জোর করে মুখ ফিরিয়ে আর-একদিকে চেয়ে রইলুম।

সমস্ত ফুলগুলি কুড়িয়ে আমার আঁচলে একটা গেরো দিয়ে, নরেন তার জায়গায় ফিরে গেল। খানিকক্ষণ আমার পানে চুপ করে চেয়ে থেকে বললে, যে ঠাট্টা বুঝতে পারে না, এত অল্পে রাগ করে, তার ফিলজফি পড়া কেন? আমি কালই গিয়ে ব্রজবাবুকে বলে দেব, তিনি আর যেন পণ্ডশ্রম না করেন।

আমি আগেই চোখ মুছে ফেলেছিলুম, বললুম, কে রাগ করেছে?

যে ফুল ফেলে দিলে?

ফুল ত আপনি পড়ে গেল।

মুখখানাও বুঝি আপনি ফিরে আছে?

আমি ত মেঘ দেখচি।

মেঘ বুঝি এদিকে ফিরে দেখা যায় না?

কৈ যায়? বলে আমি ভুলে হঠাৎ মুখ ফেরাতেই দু'জনার চোখাচোখি হয়ে গেল। নরেন ফিক করে হেসে বললে, একখানা আরশি থাকলে যায় কি না, দেখিয়ে দিতুম। নিজের মুখে চোখেই একসঙ্গে মেঘ-বিদ্যুৎ দেখতে পেতে; কষ্ট করে আকাশ খুঁজতে হ'ত না।

আমি তখন চোখ ফিরিয়ে নিলুম। রূপের প্রশংসা আমি ঢের শুনেছি, কিন্তু নরেনের চাপা হাসি, চাপা ইঙ্গিত, সেদিন আমার বুকের মধ্যে ঢুকে আমার হৃৎপিণ্ডটাকে যেন সজোরে দুলিয়ে দিলে। এই ত সেই পাঁচ বছর আগের কথা, কিন্তু আজ মনে হয়, সে সৌদামিনী বুঝি বা আর কেউ ছিল।

নরেন বললে, মেঘ না কাটলে ব্রজবাবুকে বলে দেব, লেখাপড়া শেখান মিছে। তিনি আর যেন কষ্ট না করেন।

আমি বললুম, বেশ ত, ভালই ত। আমি ও-সব পড়তেও চাইনে, বরং গল্পের বই পড়তেই আমার ঢের ভাল লাগে।

নরেন হাততালি দিয়ে বলে উঠল, দাঁড়াও বলে দিচ্ছি, আজকাল নভেল পড়া হচ্ছে বুঝি?

আমি বললুম, গল্পের বই তবে আপনি নিজে পড়েন কেন?

নরেন বললে, সে শুধু তোমাকে গল্প বলবার জন্যে। নইলে পড়তুম না। বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে চেয়ে বললে, আচ্ছা, এ জল যদি আজ না থামে? কি করবে?

বললুম, ভিজে ভিজে চলে যাব।

আচ্ছা, এ যদি আমাদের পাহাড়ী বৃষ্টি হ'ত, তা হলে?

গল্প জিনিসটা চিরদিন কি ভালই বাসি! একটুখানি গন্ধ পাবামাত্র আমার চোখের দৃষ্টি একমুহূর্তে আকাশ থেকে নরেনের মুখের উপর নেমে এলো। জিজ্ঞেস করে ফেললুম, সে দেশের বৃষ্টির মধ্যে বুঝি বেরোনো যায় না?

নরেন বললে, একেবারে না। গায়ে তীরের মত বেঁধে।

আচ্ছা, তুমি সে বৃষ্টি দেখেচ? পোড়া-মুখ দিয়ে তুমি বার হয়ে গেলে। ভাবি, জিভটা সঙ্গে সঙ্গে যদি মুখ থেকে খসে পড়ে যেত!

সে বললে, এর পর যদি একজন আপনি বলে ডাকে, সে আর একজনের মরা-মুখ দেখবে।

কেন দিব্যি দিলেন? আমি ত কিছুতেই তুমি বলব না।

বেশ, তা হলে মরা মুখ দেখো।

দিব্যি কিছুই না। আমি মানিনে।

কেমন মান না, একবার আপনি বলে প্রমাণ করে দাও।

মনে মনে রাগ করে বললুম, পোড়ামুখী! মিছে তেজ তোর রইল কোথায়! মুখ দিয়ে ত কিছুতেই বার করতে পারলি নে। কিন্তু দুর্গতির যদি ঐখানেই সেদিন শেষ হয়ে যেত!

ক্রমে আকাশের জল থামল বটে, কিন্তু পৃথিবীর জলে সমস্ত দুনিয়াটা যেন ঘুলিয়ে একাকার করে দিলে। সন্ধ্যা হয় হয়। ফুল ক'টি আঁচলে বাঁধা, কাদা-ভরা বাগানের পথে বেরিয়ে পড়লুম।

নরেন বললে, চল, তোমাকে পৌঁছে দি।

আমি বললুম, না।

মন যেন বলে দিলে, সেটা ভাল না। কিন্তু অদৃষ্টকে ডিঙিয়ে যাব কি করে? বাগানের ধারে এসে ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। সমস্ত নালাটা জলে পরিপূর্ণ। পার হই কি করে?

নরেন সঙ্গে আসেনি, কিন্তু সেইখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল। আমাকে চুপ করে দাঁড়াতে দেখে, অবস্থাটা বুঝে নিতে তার দেরী হ'ল না। কাছে এসে বললে, এখন উপায়?

আমি কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললুম, নালায় ডুবে মরি, সেও আমার ভাল, কিন্তু একলা অতদূর সদর রাস্তা ঘুরে আমি কিছুতেই যাব না। মা দেখলে—

কথাটা আমি শেষ করতেই পারলুম না।

নরেন হেসে বললে, তার আর কি, চল তোমাকে সেই পিটুলি গাছটার

উপর দিয়ে পার করে দিই।

তাই ত বটে! আহ্লাদে মনে মনে নেচে উঠলুম। এতক্ষণ আমার মনে পড়েনি যে খানিকটা দূরে একটা পিটুলি গাছ বহুকাল থেকে ঝড়ে উপড়ে নালার ওপর ব্রিজের মত পড়ে আছে। ছেলেবেলায় আমি নিজেই তার উপর দিয়ে এপার ওপার হয়েচি।

খুশী হয়ে বললুম, তাই চল—

নরেন তার চেয়েও খুশী হয়ে বললে, কেমন মিষ্টি শোনালে বল ত!

বললুম, যাও—

সে বললে, নির্বিঘ্নে পার না করে দিয়ে কি আর যেতে পারি।

বললুম, তুমি কি আমার পারের কাণ্ডারী নাকী?

আমি আজও ভেবে পাইনি, এ কথা কি করেই বা মনে এল এবং কেমন করেই বা মুখ দিয়ে বার করলুম। কিন্তু সে যখন আমার মুখপানে চেয়ে একটু হেসে বললে, দেখি, তাই যদি হতে পারি—আমি ঘেন্নায় যেন মরে গেলুম!

সেখানে এসে দেখি, পার হওয়া সোজা নয়। একে ত স্থানটা গাছের ছায়ায় অন্ধকার, তাতে পিটুলি গাছটাই জলে ভিজে ভিজে যেমন পিছল তেমনি উঁচু-নীচু হয়ে আছে। তলা দিয়ে সমস্ত বৃষ্টির জল হুহু শব্দে বয়ে যাচ্ছে, আমি একবার পা বাড়াই, একবার টেনে নিই। নরেন খানিকক্ষণ দেখে বললে, আমার হাত ধরে যেতে পারবে?

বললুম, পারব। কিন্তু তার হাত ধরে এমনি কাণ্ড করলুম যে, সে কোনমতে টাল সামলে এদিকে লাফিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করলে। কয়েক মুহূর্ত সে চুপ করে আমার মুখপানে চেয়ে রইল, তার পরেই তার চোখ দুটো যেন ঝকঝক করে উঠল। বললে, দেখবে, একবার সত্যিকারের কাণ্ডারী হতে পারি কি না?

আশ্চর্য হয়ে বললুম, কি করে?

এমনি করে, বলেই সে নত হয়ে আমার দুই হাঁটুর নীচে এক হাত, ঘাড়ের নীচে অন্য হাত দিয়ে চোখের নিমেষে তার বুকের কাছে তুলে নিয়ে সেই গাছটার উপর পা দিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে আমি চোখ বুজে বাঁ হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলুম। নরেন দ্রুতপদে পার হয়ে এপারে চলে এল। কিন্তু নামাবার আগে, আমার ঠোঁট দুটোকে একেবারে যেন পুড়িয়ে দিল। কিন্তু থাক গে! কম ঘেন্নায় কি আর এ দেহের প্রতি অঙ্গ অহর্নিশি গলায় দড়ি

দিতে চায়!

শিউরুতে শিউরুতে বাড়ি চলে এলুম, ঠোঁট দুটো তেমনি জ্বলতেই লাগল বটে, কিন্তু সে জ্বালা লঙ্কা-মরিচখোরের জ্বলুনির মত যত জ্বলতে লাগল, জ্বালার তৃষ্ণা তত বেড়ে যেতেই লাগল।

মা বললেন, ভালো মেয়ে তুই সদু, এলি কি করে? নালাটা ত জলে জলমগ্ন হয়েছে দেখে এলুম। সেই গাছটার ওপর দিয়ে বুঝি হেঁটে এলি? পড়ে মরতে পারলি নে?

না মা। সে পুণ্য থাকলে আর এ গল্প লেখবার দরকার হবে কেন?

তার পরদিন নরেন মামার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমি সেইখানেই বসেছিলুম, তার পানে চাইতে পারলুম না, কিন্তু আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। ইচ্ছে হ'ল ছুটে পালাই, কিন্তু ঘরের পাকা মেঝে যে চোরাবালির মত আমার পা দুটোকে একটু একটু করে গিলতে লাগল, আমি নড়তেও পারলুম না। মুখ তুলে দেখতেও পারলুম না।

নরেনের যে কি অসুখ হ'ল, তা শয়তানই জানে, অনেকদিন পর্যন্ত আর সে কলকাতায় গেল না। রোজই দেখা হতে লাগল। মা মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে আমাকে আড়ালে ডেকে পাঠিয়ে বলতে লাগলেন, ওদের পুরুষমানুষদের লেখাপড়ার কথাবার্তা হয়, তুই তার মধ্যে হাঁ করে বসে কি শুনিস বল ত? যা, বাড়ির ভেতরে যা। এতবড় মেয়ের হদি লজ্জাশরম একটুকু আছে!

এক-পা এক-পা করে আমার ঘরে চলে যেতুম, কিন্তু কোন কাজে মন দিতে পারতুম না। যতক্ষণ সে থাকত তার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর অবিশ্রাম বাইরের পানেই আমাকে টানতে থাকত।

আমার মামা আর যাই হোন, তাঁর মনটা প্যাঁচালো ছিল না। তা ছাড়া, লিখে পড়ে তর্ক করে ভগবানকে উড়িয়ে দেবার ফন্দিতেই সমস্ত অন্তঃকরণটা তাঁর এমনি অনুক্ষণ ব্যস্ত হয়ে থাকত যে, তাঁর নাকের ডগায় কি যে ঘটচে তা দেখতে পেতেন না। আমি এই বড় একটা মজা দেখেচি, জগতের সবচেয়ে নামজাদা নাস্তিকগুলোই হচ্চে সবচেয়ে নিরেট বোকা। ভগবানের যে লীলার অন্ত নেই। তিনি যে এই 'না' রূপেই তাদের পনরো আনা মন ভরে থাকেন, এ তারা টেরই পায় না। সপ্রমাণ হোক, অপ্রমাণ হোক, তাঁর ভাবনাতে সারাদিন কাটিয়ে দিয়ে বলে, সংসারে মানুষগুলো কি বোকা! তারা সকাল-সন্ধ্যায় বসে মাঝে মাঝে ভগবানের চিন্তা করে। আমার মামারও ছিল সেই

দশা। তিনি কিছুই দেখতে পেতেন না। কিন্তু মা ত তা নয়। তিনি যে আমারই মত মেয়েমানুষ। তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া ত সহজ ছিল না। আমি নিশ্চয় জানি, মা আমাদের সন্দেহ করেছিলেন।

আর সামাজিক বাধা আমাদের দুজনের মধ্যে যে কতবড় ছিল, এ শুধু যে তিনিই জানতেন, আমি জানতুম না, তা নয়। ভাবলেই আমার বুকের সমস্ত রস শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠত, তাই ভাবনার এই বিশ্রী দিকটাকে আমি দু'হাতে ঠেলে রাখতুম। কিন্তু শত্রুর বদলে যে বন্ধুকেই ঠেলে ফেলেচি, তাও টের পেতুম। কিন্তু হলে কি হয়? যে মাতাল একবার কড়া-মদ খেতে শিখেচে, জল দেওয়া মদে আর তার মন ওঠে না। নির্জলা বিষের আগুনে কলজে পুড়িয়ে তোলাতেই যে তখন তার মস্ত সুখ।

আর একটা জিনিস আমি কিছুতেই ভুলতে পারতুম না। সেটা মজুমদারদের ঐশ্বর্যের চেহারা। ছেলেবেলা মায়ের সঙ্গে কতদিনই ত তাদের বাড়িতে বেড়াতে গেছি। সেই সব ঘরদোর, ছবি-দেয়ালগিরি, আলমারি, সিন্দুক, আসবাবপত্রের সঙ্গে কোন্ একটা ভাবী ছোট একতলা শ্বশুরবাড়ির কদাকার মূর্তি কল্পনা করে মনে মনে আমি যেন শিউরে উঠতুম।

মাস-খানেক পরে একদিন সকালবেলা নদী থেকে স্নান করে বাড়িতে পা দিয়েই দেখি, বারান্দার ওপর একজন প্রৌঢ়-গোছের বিধবা স্ত্রীলোক মায়ের কাছে বসে গল্প করচে। আমাকে দেখে মাকে জিজ্ঞাসা করলে, এইটি বুঝি মেয়ে?

মা ঘাড় নেড়ে বললেন, হাঁ মা, এই আমার মেয়ে। বাড়ন্ত গড়ন, নইলে—

স্ত্রীলোকটি হেসে বললে, তা হোক, ছেলেটির বয়সও প্রায় ত্রিশ, দু'জনের মানাবে ভাল। আর ঐ শুনতেই দোজবরে, নইলে যেন কার্তিক।

আমি দ্রুতপদে ঘরে চলে গেলুম। বুঝলুম, ইনি ঘটকঠাকরুন, আমার সম্বন্ধ এনেছেন।

মা চেঁচিয়ে বললেন, কাপড় ছেড়ে একবার এসে ব'স মা।

কাপড় ছাড়া চুলোয় গেল, ভিজে কাপড়েই দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগলুম। বুকের কাঁপুনি যেন আর থামতে চায় না। শুনতে পেলুম, চিতোর গ্রামের কে একজন রাধাবিনোদ মুখুয্যের ছেলে ঘনশ্যাম। পোড়াকপালে নাকি অনেক দুঃখ ছিল, তাই আজ যে নাম জপের মন্ত্র, সে নাম শুনে সেদিন গা জ্বলে যাবে কেন?

শুনলুম, বাপ নেই, কিন্তু মা আছেন। ছোট দুটি ভাই, এক ভায়ের বিয়ে হয়েছে, একটি এখনও পড়ে। সংসার বড়রই ঘাড়ে, তাই এনট্রান্স পাশ করেই রোজগারের ধান্দায় পড়া ছাড়তে হয়েছে। ধান, চাল, তিসি, পাট প্রভৃতির দালালি করে উপায় মন্দ করেন না। তাঁরই উপর সমস্ত নির্ভর। তা ছাড়া ঘরে নারায়ণ-শিলা আছেন, দুটো গরু আছে, বিধবা বোন আছে—নেই কি ?

নেই শুধু সংসারের বড়বৌ। সাত বছর আগে বিয়ের একমাসের মধ্যেই তিনি মারা যান, তারপর এতদিন বাদে এই চেষ্টা। সাত বচ্ছর! ঘটকীকে উদ্দেশ করে মনে মনে বললুম, পোড়ারমুখী, এতদিন কি তুই শুধু আমার মাথা খেতেই চোখ বুজে ঘুমুচ্ছিলি ?

মায়ের ডাকাডাকিতে কাপড় ছেড়ে কাছে এসে বসলুম। সে আমাকে খুঁটিয়ে দেখে বললে, মেয়ে পছন্দ হয়েচে, এখন দিন স্থির করলেই হল। মায়ের চোখ দুটিতে জল টলটল করতে লাগল, বললেন, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মা, আর কি বলব !

মামা শুনে বললেন, এনট্রান্স ? তবে বলে পাঠা, এখন বছর-দুই সতুর কাছে ইংরিজী পড়ে যাক, তবে বিয়ের কথা কওয়া যাবে।

মা বললেন, তোমার পায়ে পড়ি দাদা, অমত ক'রো না, এমন সুবিধে আর পাওয়া যাবে না। দিতে-থুতে কিছু হবে না—

মামা বললেন, তা হলে হাত-পা বেঁধে গঙ্গায় দিগে যা, সেও এক পয়সা চাইবে না।

মা বললেন, তা ত দেবেই ; পনর বছর বেঁচে রয়েছে যে !

মা রাগে দুঃখে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, তুমি কি ওর তবে বিয়ে দেবে না দাদা ? এরপরে একেবারেই পাত্র জুটবে না।

মামা বললেন, সেই ভয়ে ত আগে থেকে ওকে জলে ফেলে দিতে পারা যায় না !

মা বললেন, ছেলেটিকে একবার নিজের চোখে দেখে এস না দাদা, পছন্দ না হয়, না দেবে।

মামা বললেন, সে ভাল কথা। রবিবার যাব বলে চিঠি লিখে দিচ্ছি।

ভাঙ্‌চির ভয়ে কথাটা মা গোপনে রেখেছিলেন এবং মামাকেও সাবধান করে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন না, এমন চোখ-কানও ছিল যাকে কোন সতর্কতা ফাঁকি দিতে পারে না।

বাগানে একটুকরো শাকের ক্ষেত করেছিলুম। দিন-দুই পরে দুপুরবেলা একটা ভাঙ্গা খুন্‌তি নিয়ে তার ঘাস তুলচি, পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখি নরেন। তার সে-রকম মুখের চেহারা অনেকদিন পরে আর একবার দেখেছিলুম, সত্যি, কিন্তু আগে কখনও দেখিনি। বুকে এমন একটা ব্যথা বাজল যা কখন কোনদিন পাইনি। সে বললে, আমাকে ছেড়ে কি সত্যিই চললে?

কথাটা বুঝেও যেন বুঝতে পারলুম না। বলে ফেললুম, কোথায়?

সে বললে, চিতোর।

স্পষ্ট হ'বা-মাত্রই লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল, কোন উত্তর মুখে এল না।

সে পুনরায় বললে, তাই আমিও বিদায় নিতে এসেছি ; বোধ হয় জন্মের মতই। কিন্তু তার আগে দুটো কথা বলতে চাই—শুনবে?

বলতে বলতেই তার গলাটা যেন ধরে গেল। তবুও আমার মুখে কথা যোগাল না—কিন্তু মুখ তুলে চাইলুম। এ কি! দেখি, তার দু'চোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে।

ওরে পতিত! ওরে দুর্বল নারী! মানুষের চোখের জল সহ্য করবার ক্ষমতা ভগবান তোকে যখন একেবারে দেননি, তখন তোর আর সাধ্য ছিল কি! দেখতে দেখতে আমারও চোখের জলে বুক ভেসে গেছে। নরেন কাছে এসে কোঁচার খুঁট দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে হাত ধরে বললে, চল, ওই গাছটার তলায় গিয়ে বসি গে, এখানে কেউ দেখতে পাবে।

মনে বুঝলুম, এ অন্যায়, একান্ত অন্যায়! কিন্তু তখনও যে তার চোখের পাতা ভিজে, তখনও যে তার কণ্ঠস্বর কান্নায় ভরা।

বাগানের একপ্রান্তে একটা কাঁটালী-চাঁপার কুঞ্জ ছিল, তার মধ্যে সে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালে।

একটা ভয়ে আমার বুকের মধ্যে দুরদুর করছিল, কিন্তু সে নিজেই দূরে গিয়ে বসে বললে, এই একান্ত নির্জন স্থানে তোমাকে ডেকে এনেছি বটে, কিন্তু তোমাকে ছোঁব না, এখনও তুমি আমার হওনি।

তার শেষ কথায় আবার পোড়া চোখে জল এসে পড়ল। আঁচলে চোখ মুছে মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলুম।

তারপর অনেক কথাই হল, কিন্তু থাক গে সে-সব। আজও ত প্রতিদিনকার

অতি তুচ্ছ ঘটনাটি পর্যন্ত মনে করতে পারি, মরণেও যে বিস্মৃতি আসবে, সে আশা করতেও যেন ভরসা হয় না; একটা কারণে আমি আমার এতবড় দুর্গতিতেও কোনদিন বিধাতাকে দোষ দিতে পারিনি। স্পষ্ট মনে পড়ে, আমার চিত্তের মাঝে থেকে নরেনের সংস্রব তিনি কোনদিন প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেন নি। সে যে আমার জীবনে কত বড় মিথ্যে, এ-ত তাঁর অগোচর ছিল না। তাই তার প্রণয়-নিবেদনের মুহূর্তের উত্তেজনা পরক্ষণের কতবড় অবসাদে যে ডুবে যেত, সে আমি ভুলিনি। যেন কার কত চুরি-ডাকাতি সর্বনাশ করে ঘরে ফিরে এলুম, এমনি মনে হত। কিন্তু এমনি পোড়া কপাল যে, অন্তর্যামীর এতবড় ইঙ্গিতেও আমার হুঁশ হয়নি। হবেই বা কি করে? কোনদিন ত শিখিনি যে, ভগবান মানুষের বুকের মধ্যেও বাস করেন। এই সবই তাঁরই নিষেধ।

মামা পাত্র দেখতে যাত্রা করলেন। যাবার সময় কতই না ঠাট্টা-তামাশা করে গেলেন। মা মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে রইলেন, মনে মনে বেশ বুঝলেন, এ যাওয়া পণ্ডশ্রম। পাত্র তাঁর কিছুতেই পছন্দ হবে না।

কিন্তু আশ্চর্য, ফিরে এসে আর বড় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলেন না। বললেন, হাঁ, ছেলেটি পাশ-টাশ তেমন কিছু করতে পারেনি বটে, কিন্তু মুখ্যু বলেও মনে হ'ল না! তা ছাড়া বড় নম্র, বড় বিনয়ী; আর একটা কি জিনিস গিন্নি, ছেলেটির মুখের ভাবে কি একটু আছে, ইচ্ছে হয়, বসে বসে আরও দু'দণ্ড আলাপ করি।

মা আহ্লাদে মুখখানি উজ্জ্বল করে বললেন, তবে আর আপত্তি ক'রো না দাদা, মত দাও—সত্বর একটা কিনারা হয়ে যাক।

মামা বললেন, আচ্ছা, ভেবে দেখি।

আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে নিরাশার আশাটুকু বুকে চেপে ধরে মনে মনে বললুম, যাক, মামা এখনো মতিস্থির করতে পারেন নি। এখনও বলা যায় না। কিন্তু কে জানত, তাঁর ভাগ্নীর বিয়ের সম্বন্ধে মতিস্থির করবার পূর্বেই তাঁর নিজের সম্বন্ধে মতিস্থির করবার ডাক এসে পড়বে। যাঁকে সারাজীবন সন্দেহ করে এসেছেন, সেদিন অত্যন্ত অকস্মাৎ তাঁর দূত এসে যখন একেবারে মামার শিয়রে দাঁড়াল, তখন তিনি চমকে গেলেন। তাঁর কথা শুনে আমাদেরও বড় কম চমক লাগল না। মাকে কাছে ডেকে বললেন, আমি মত দিয়ে যাচ্ছি বোন, সত্বর সেখানেই বিয়ে দিস। ছেলেটির যথার্থ ভগবানে বিশ্বাস আছে।

মেয়েটি সুখে থাকবে। অবাক কাণ্ড! কিন্তু অবাক হলেন না শুধু মা। নাস্তিকতা তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। তাঁর ধারণা ছিল, মরণকালে সবাই ঘুরে ফিরে হরি বলে। তাই তিনি বলতেন, মাতাল তার মাতাল বন্ধুকে যত ভালই বাসুক না কেন, নির্ভর করবার বেলায় করে শুধু তাকে, যে মদ খায় না। জানি না, কথাটা কতখানি সত্যি।

হৃদ্‌রোগে মামা মারা গেলেন, আমরা পড়লুম অকূল পাথরে। সুখে-দুঃখে কিছুদিন কেটে গেল বটে, কিন্তু, যে বাড়িতে অবিবাহিতা মেয়ের বয়স পনর পার হয়ে যায়, সেখানে আলস্যভরে শোক করবার সুবিধা থাকে না। মা চোখ মুছে উঠে বসে আবার কোমর বেঁধে লাগলেন।

অবশেষে অনেকদিন অনেক কথা-কাটাকাটির পর, বিবাহের লগ্ন যখন সত্যিই আমার বুকে এসে বিঁধল তখন বয়সও ষোল পার হয়ে গেল। তখনও আমি প্রায় এমনিই লম্বা। আমার এই দীর্ঘ দেহটার জন্য জননীর লজ্জা ও কুণ্ঠার অবধি ছিল না। রাগ করে প্রায়ই ভৎ‍‍র্সনা করতেন, হতভাগা-মেয়েটার সবই সৃষ্টিছাড়া। একে ত বিয়ের কনের পক্ষে সতের বছর একটা মারাত্মক অপরাধ, তার উপর এই দীর্ঘ গড়নটা যেন তাকে ডিঙিয়ে গিয়েছিল। অন্ততঃ সে রাতটার জন্য যদি আমাকে কোনরকমে মুচড়ে মাচড়ে একটু খাটো করে তুলতে পারতেন, মা বোধ করি তাতেও পেছুতেন না। কিন্তু সে ত হবার নয়। আমি আমার স্বামীর বুক ছাড়িয়ে একেবারে দাড়ির কাছে গিয়ে পৌছুলুম।

কিন্তু শুভদৃষ্টি হ'ল না, আমি ঠিক রাগে নয়, কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণায় চোখ বুজে রইলুম। কিন্তু তাও বলি, এমন কোন অসহ্য মর্মান্তিক দুঃখও তখন আমি মনের মধ্যে পাইনি।

ইতিপূর্বে কতদিন সারারাত্রি জেগে ভেবেছি, এমন দুর্ঘটনা যদি সত্যিই কপালে ঘটে, নরেন এসে আমাকে না নিয়ে যায়, তবু আর কারও সঙ্গে আমার বিয়ে কোনমতেই হতে পারবে না। সে রাত্রে নিশ্চয় আমার বুক চিরে ভলকে ভলকে রক্ত মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়বে, ধরাধরি করে আমাকে বিবাহ-সভা থেকে বিছানায় তুলে নিয়ে যেতে হবে, এ বিশ্বাস আমার মনে একেবারে বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু কৈ কিছুই ত হ'ল না। আরও পাঁচজন বাঙ্গালীর মেয়ের যেমন হয় শুভকর্ম তেমনি করে আমারও সমাধা হয়ে গেল এবং তেমনি করেই একদিন শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করলুম।

শুধু যাবার সময়টিতে পালকির ফাঁক দিয়ে সেই কাঁটালী-চাপার কুঞ্জটায় চোখ পড়ায় হঠাৎ চোখে জল এল। সে যে আমাদের কতদিনের কত চোখের জল, কত দিব্যি-দিলাসার নীরব সাক্ষী।

আমার চিতোর গ্রামের সম্বন্ধটা যেদিন পাকা হয়ে গেল, ওই গাছটার আড়ালে বসেই অনেক অশ্রু বিনিময়ের পর স্থির হয়েছিল, সে এসে একদিন আমাকে নিয়ে চলে যাবে। কেন, কোথায় প্রভৃতি বাহুল্য প্রশ্নে তখন আবশ্যকও হয়নি।

আর কিছু না, শুধু যাবার সময় একবার যদি দেখা হ'ত। কেন সে আমাকে আর চাইলে না, কেন আর একটা দিনও দেখা দিলে না, শুধু যদি খবরটা পেতুম।

শ্বশুরবাড়ি গেলুম, বিয়ের বাকী অনুষ্ঠানও শেষ হয়ে গেল। অর্থাৎ আমি আমার স্বামীর ধর্মপত্নীর পদে একবার পাকা হয়ে বসলাম।

দেখলুম, স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণা শুধু একা আমার নয়। বাড়িসুদ্ধ আমার দলে। শ্বশুর নেই, সৎ-শাশুড়ী তাঁর নিজের ছেলে দুটি, একটি বৌ এবং বিধবা মেয়েটি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এতদিন নিরাপদে সংসার করছিলেন, হঠাৎ একটি সতের-আঠার বছরের মস্ত বৌ দেখে তাঁর সমস্ত মন সশস্ত্র জেগে উঠল। কিন্তু মুখে বললেন, বাঁচলুম বৌমা, তোমার হাতে সংসার ফেলে দিয়ে এখন দু'দণ্ড ঠাকুরদের নাম করতে পাব। ঘনশ্যাম আমার পেটের ছেলের চেয়েও বেশী। সে বেঁচে থাকলেই তবে সব বজায় থাকবে এইটি বুঝে শুধু কাজ কর মা, আর কিছু আমি চাইনে!

তাঁর কাজ তিনি করলেন; আমার কাজ আমি করলুম, বললুম, আচ্ছা। কিন্তু সে ওই কুস্তিগিরের তাল ঠোকার মত। প্যাঁচ মারতে যে দু'জনেই জানি, তা ইশারায় জানিয়ে দেওয়া।

কিন্তু কত শীঘ্র মেয়েমানুষ যে মেয়েমানুষকে চিনতে পারে, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। তাঁকে জানতে আমার যেমন দেরি হ'ল না আমাকেও দু'দিনের মধ্যে চিনে নিয়ে তিনিও তেমনিই আরামের নিশ্বাস ফেললেন, বেশ বুঝলেন, স্বামীর খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা, খরচ-পত্র নিয়ে দিবারাত্রি চক্র ধরে ফোঁসফোঁস করে বেড়াবার মত আমার উৎসাহও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

মেয়েমানুষের তূণে যতপ্রকার দিব্যাস্ত্র আছে, 'আড়ি-পাতা'টা ব্রহ্মাস্ত্র। সুবিধা পেলে এতে মা-মেয়ে শাশুড়ী বৌ, জা-ননদ, কেউ কাকে খাতির করে

না। আমি ঠিক জানি, আমি যে পালঙ্কে না শুয়ে ঘরের মেঝেতে একটা মাদুর টেনে নিয়ে সারারাত্রি পড়ে থাকতুম, এ সুসংবাদ তাঁর অগোচর ছিল না। আগে যে ভেবেছিলুম, নরেনের বদলে আর কারো ঘর করতে হলে সেইদিনই আমার বুক ফেটে যাবে, দেখলুম, সেটা ভুল। ফাটবার চেরবার কোন লক্ষণই টের পেলুম না। কিন্তু তাই বলে একশয্যায় শুতেও আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হ'ল না।

দেখলুম, আমার স্বামীটি অদ্ভুত-প্রকৃতির লোক। আমার আচরণ নিয়ে তিনি কিছুদিন পর্যন্ত কোন কথাই কইলেন না; অথচ মনে মনে রাগ কিংবা অভিমান করে আছেন, তাও না। শুধু একদিন একটু হেসে বললেন, ঘরে আর একটা খাট এনে বিছানাটা বড় করে নিলে কি শুতে পার না?

আমি বললুম, দরকার কি, আমার ত এতে কষ্ট হয় না।

তিনি বললেন; না হলেও একদিন অসুখ করতে পারে যে।

আমি বললুম, তোমার এতই যদি ভয়, আমার আর কোন ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে দিতে পার না?

তিনি বললেন, ছিঃ তা কি হয়? তাতে কত রকমের অপ্রিয় আলোচনা উঠবে।

বললুম, ওঠে উঠুক, আমি গ্রাহ্য করিনে।

তিনি একমুহূর্ত চুপ করে আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে বললেন, এতবড় বুকের পাটা যে তোমার চিরকাল থাকবে, এমন কি কথা আছে? বলে একটুখানি হেসে কাজে চলে গেলেন।

আমার মেজদেওর টাকা চল্লিশের মত কোথাও চাকরি করতেন; কিন্তু একটা পয়সা কখনো সংসারে দিতেন না। অথচ তাঁর আপিসের সময়ে ভাত, আপিস থেকে এলে পা-ধোবার গাড়ু-গামছা, জল-খাবার পান-তামাক ইত্যাদি যোগাবার জন্যে বাড়িসুদ্ধ সবাই যেন ত্রস্ত হয়ে থাকত। দেখতুম আমার স্বামী, আমার মেজদেওর হয়ত কোনদিন একসঙ্গেই বিকেলবেলায় বাড়ি ফিরে এলেন, সবাই তাঁর জন্যে ব্যতিব্যস্ত; এমনকি চাকরটা পর্যন্ত তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্যে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চে। একতিল দেরি কিংবা অসুবিধা হলে যেন পৃথিবী রসাতলে যাবে। অথচ আমার স্বামীর দিকে কেউ চেয়েও দেখত না। তিনি আধঘণ্টা ধরে হয়ত এক ঘটি জলের জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন, কারও সেদিক গ্রাহ্যই নেই। অথচ এদের খাওয়া পরা সুখ-সুবিধের জন্যেই

তিনি দিবারাত্রি খেটে মরচেন। ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়াও মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে, কিন্তু তাঁর যেন কিছুতেই শ্রান্তি নেই, কোন দুঃখই যেন তাঁকে পীড়া দিতে পারে না। এমন শান্ত, এত ধীর, এতবড় পরিশ্রমী এর আগে কখনও চোখে দেখিনি। আর চোখে দেখেচি বলেই লিখতে পারচি, নইলে শোনা কথা হলে বিশ্বাস করতেই পারতুম না, সংসারে এমন ভালোমানুষও থাকতে পারে। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। সব-তাতেই বলতেন, থাক থাক, আমার এতেই হবে।

স্বামীর প্রতি আমার মায়াই ত ছিল না, বরঞ্চ বিতৃষ্ণার ভাবই ছিল। তবু এমন একটা নিরীহ লোকের উপর বাড়িসুদ্ধ সকলের এতবড় অন্যায় অবহেলায় আমার গা যেন জ্বলে যেতে লাগল।

বাড়িতে গরুর দুধ বড় কম হ'ত না। কিন্তু তাঁর পাতে কোনদিন বা একটু পড়ত, কোনদিন পড়ত না। হঠাৎ একদিন সইতে না পেরে বলে ফেলেছিলুম আর কি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল ছি ছি, কি নির্লজ্জই আমাকে তা হলে এরা মনে করল! তা ছাড়া এরা সব আপনার লোক হয়েও যদি দয়ামায়া না করে, আমারই বা এত মাথাব্যথা কেন? আমি কোথাকার কে? পর বৈ ত না।

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন সকালবেলা রান্নাঘরে বসে মেজঠাকুরপোর জন্যে চা তৈরি করচি, স্বামীর কণ্ঠস্বর আমার কানে গেল। তাঁর সকালেই কোথায় বার হবার দরকার ছিল, ফিরতে দেরি হবে, মাকে ডেকে বললেন, কিছু খেয়ে গেলে বড় ভাল হত মা, খাবার-টাবার কিছু আছে?

মা বললেন, অবাক করলে ঘনশ্যাম। এত সকালে খাবার পাব কোথায়?

স্বামী বললেন, তবে থাক, ফিরে এসেই খাব। বলে চলে গেলেন।

সেদিন আমি কিছুতেই আপনাকে আর সামলাতে পারলুম না। আমি জানতুম, ও পাড়ার বোসেরা তাদের বেয়াইবাড়ির পাওয়া সন্দেশ-রসগোল্লা পাড়ায় বিলিয়েছিল। কাল রাত্রে আমাদেরও কিছু দিয়েছিল।

শাশুড়ী ঘরে ঢুকতেই বলে ফেললুম, কালকের খাবার কি কিছুই ছিল না মা?

তিনি একেবারে আকাশ থেকে পড়ে বললেন, খাবার আবার কে কিনে আনলে বৌমা?

আমি বললুম, সেই যে বোসেরা দিয়ে গিয়েছিল?

তিনি বললেন, ও মা সে আবার ক'টা যে, আজ সকাল পর্যন্ত থাকবে? সে ত কালই শেষ হয়ে গেছে।

বললুম, তা ঘরেই কিছু খাবার তৈরি করে দেওয়া যেত না মা?

শাশুড়ী বললেন, বেশ ত বৌমা, তাই কেন দিলে না? তুমি ত বসে বসে সমস্ত শুনছিলে বাছা?

চুপ করে রইলুম। আমার কি-ই বা বলবার ছিল। স্বামীর প্রতি আমার ভালবাসার টান ত আর বাড়িতে কারো অবিদিত ছিল না!

চুপ করে রইলুম সত্যি, কিন্তু ভেতরে মনটা আমার জ্বলতেই লাগল। দুপুরবেলা শাশুড়ী ডেকে বললেন, খাবে এস বৌমা, ভাত বাড়া হয়েছে।

বললুম, আমি এখন খাব না, তোমরা খাও গে।

আমার আজকের মনের ভাব শাশুড়ী লক্ষ্য করছিলেন, বললেন, খাবে না কেন শুনি?

বললুম, এখন ক্ষিদে নেই।

আমার মেজজা আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় ছিলেন। রান্নাঘরের ভেতর থেকে ঠোকর দিয়ে বলে উঠলেন, বটঠাকুরের খাওয়া না হলে বোধ হয় দিদির ক্ষিদে হবে না, মা?

শাশুড়ী বললেন, তাই নাকি বৌমা, বলি এ নূতন ঢঙ শিখলে কোথায়?

তিনি কিছুই মিথ্যে বলেন নি, আমার পক্ষে এ ঢঙই বটে, তবু খোঁটা সইতে পারলুম না, জবাব দিয়ে বললুম, নূতন হবে কেন মা, তোমাদের সময়ে কি এ রীতির চলন ছিল না? ঠাকুরদের খাবার আগেই কি খেতে?

তবু ভাল, ঘনশ্যামের এতদিনে কপাল ফিরল। বলে শাশুড়ী মুখখানা বিকৃত করে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

মেজজায়ের গলা কানে গেল। তিনি আমাকে শুনিয়েই বললেন, তখনই ত বলেছিলুল মা, বুড়ো শালিক পোষ মানবে না!

রাগ করে ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু এইবার সমস্ত জিনিসটা মনে মনে আলোচনা করে লজ্জায় যেন মাথা কাটা যেতে লাগল। কেবলই মনে হতে লাগল, তাঁর খাওয়া হয়নি বলে খাইনি, তাঁর কথা নিয়ে ঝগড়া করেছি, ফিরে এসে, এ-সব যদি তাঁর কানে যায়? ছি ছি! কি ভাবছেন তিনি! আমার এতদিনের আচরণের সঙ্গে এ ব্যবহার এমনি বিসদৃশ খাপছাড়া যে নিজের লজ্জাতেই নিজে মরে যেতে লাগলুম।

কিন্তু বাচলুম, ফিরে এলে এ কথা কেউ তাকে শোনালে না।

সত্যিই বাঁচলুম, এর একবিন্দু মিছে নয়. কিন্তু আচ্ছা, একটা কথা যদি বলি, তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে কি? যদি বলি, যে রাত্রে পরিশ্রান্ত স্বামী শয্যার উপর ঘুমিয়ে রইলেন, আর নীচে যতক্ষণ না আমার ঘুম এল, ততক্ষণ ফিরে ফিরে কেবলই সাধ হতে লাগল, কেউ যদি কথাটা ওঁর কানে তুলে দিত, অভুক্ত স্বামীকে ফেলে আজ আমি কিছুতেই খাইনি, এই নিয়ে ঝগড়া করেছি, তবু মুখ বুজে এ অন্যায় সহ্য করিনি, কথাটা তোমাদের বিশ্বাস হবে কি? না হলে তোমাদের দোষ দেব না, হলে বহুভাগ্য বলে মানব আজ আমার স্বামীর বড ত ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নেই, তাঁর নাম নিয়ে বলচি মানুষের মন-পদার্থটার যে অন্ত নেই, সেইদিন তার আভাস পেয়েছিলুম। এতবড় পাপিষ্ঠার মনের মধ্যেও এমন দুটো উলটো স্রোত একসঙ্গে বয়ে যাবার স্থান হতে পারে দেখে তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলুম।

মনে মনে বলতে লাগলুম, এ যে বড় লজ্জার কথা! নইলে এখুনি ঘুম থেকে জাগিয়ে বলে দিতুম, শুধু সৃষ্টিছাড়া ভালোমানুষ হলেই হয় না, কর্তব্য শেখাও দরকার। যে স্ত্রীর তুমি একবিন্দু খবর নাও না, সে তোমার জন্যে কি করেচে একবার চোখ মেলে দেখ। হা রে পোড়া কপাল! খদ্যোৎ চায় সূর্যদেবকে আলো ধরে পথ দেখাতে। তাই বলি, হতভাগীর স্পর্ধার কি আর আদি-অন্ত দাওনি ভগবান।

গরমের জন্য কিনা বলতে পারিনে, ক'দিন ধরে প্রায়ই মাথা ধরছিল। দিন পাঁচেক পরে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ছটফট করে কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমের মধ্যেই যেন মনে হচ্ছিল, কে পাশে বসে ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করচে একবার ঠক করে গায়ে পাখাটা ঠেকে যেতে ঘুম ভেঙে গেল ঘরে আলো জ্বলছিল, চেয়ে দেখলুম স্বামী!

রাত জেগে বসে পাখার বাতাস করে আমাকে ঘুম পাড়াচ্ছেন!

হাত দিয়ে পাখাটা ধরে ফেলে বললুম, এ তুমি কি করচ?

তিনি বললেন, কথা কইতে হবে না, ঘুমোও জেগে থাকলে মাথাধরা ছাড়বে না।

আমি বললুম, আমার মাথা ধরেচে, কে তোমাকে বললে?

তিনি একটু হেসে জবাব দিলেন, কেউ বলেনি: আমি হাত গুণতে জানি। কারো মাথা ধরলেই টের পাই।

বললুম, তা হলে অন্যদিনও পেয়েচ বল? মাথা ত শুধু আমার আজই ধরেনি।

তিনি আবার একটু হেসে বললেন, রোজই পেয়েচি। কিন্তু এখন একটু ঘুমোবে, না কথা কবে?

বললুম, মাথাধরা আমার ছেড়ে গেছে, আর ঘুমোবো না।

তিনি বললেন, তবে সবুর কর, ওষুধটা তোমার কপালে লাগিয়ে দিই, বলে উঠে গিয়ে কি একটা নিয়ে এসে ধীরে ধীরে আমার কপালে ঘষে দিতে লাগলেন। আমি ঠিক ইচ্ছে করেই যে করলুম, তা নয়, কিন্তু আমার ডান হাতটা কেমন করে তাঁর কোলের ওপর গিয়ে পড়তেই তিনি একটা হাত দিয়ে সেটা ধরে রাখলেন। হয়ত একবার একটু জোর করেও ছিলুম। কিন্তু জোর আপনিই কোথায় মিলিয়ে গেল। দুরন্ত ছেলেকে মা যখন কোলে টেনে নিয়ে জোর করে ধরে রাখেন, তখন বাইরে থেকে হয়ত সেটাকে একটুখানি অত্যাচারের মতও দেখায়, কিন্তু সে অত্যাচারের মধ্যে শিশুর ঘুমিয়ে পড়তে বাধে না।

বাইরের লোক যাই বলুক, শিশু বোঝে, ওটাই তার সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। আমার এই জড়পিণ্ড হাতটারও বোধ করি সে জ্ঞানই ছিল, নইলে কি করে সে টের পেলে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে পড়ে থাকবার এমন আশ্রয় তার আর নাই!

তারপর তিনি আস্তে আস্তে আমার কপালে হাত বুলোতে লাগলেন, আমি চুপ করে পড়ে রইলুম। আমি এর বেশী আর বলব না। আমার সেই প্রথম রাত্রির আনন্দ-স্মৃতি—সে আমার, একেবারে আমারই থাক।

কিন্তু আমি ত জানতুম, ভালবাসার যা-কিছু সে আমি শিখে এবং শেষ করে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি এসেছি। কিন্তু সে শেখা যে ডাঙ্গায় হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার শেখার মত ভুল শেখা, এই সোজা কথাটা সেদিন যদি টের পেতাম! স্বামীর কোলের উপর থেকে আমার হাতখানা যে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে শোষণ করে এই কথাটাই আমার বুকের ভেতর পৌঁছে দেবার মত চেষ্টা করছিল, এই কথাটা যদি সেদিন আমার কাছে ধরা পড়ত!

সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখলুম স্বামী ঘরে নেই কখন উঠে গেছেন। হঠাৎ মনে হ'ল স্বপন দেখিনি ত? কিন্তু চেয়ে দেখি, সেই ওষুধের শিশিটা তখনও শিয়রের কাছে রয়েছে। কি যেন মনে হ'ল, সেটা বার বার মাথায় ঠেকিয়ে

তবে কুলঙ্গিতে রেখে বাইরে এলুম।

শাশুড়ীঠাকুরুন সেইদিন থেকে আমার উপর যে কড়া নজর রাখছিলেন, সে আমি টের পেলুম। আমিও ভেবেছিলুম, মরুক গে, আমি কোন কথায় আর থাকব না। তা ছাড়া দু'দিন আসতে না আসতেই স্বামীর খাওয়া-পরা নিয়ে ঝগড়া—ছি, ছি, লোকে শুনলেই বা বলবে কি ?

কিন্তু কবে যে এর মধ্যেই আমার মনের ওপর দাগ পড়ে গিয়েছিল, কবে যে তাঁর খাওয়া-পরা নিয়ে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে উঠেছিলুম সে আমি নিজেই জানতুম না! তাই দুটো দিন যেতে-না যেতেই আবার একদিন ঝগড়া করে ফেললুম।

আমার স্বামীর কে একজন আড়তদার বন্ধু সেদিন সকালে মস্ত একটা রুইমাছ পাঠিয়েছিলেন। স্নান করতে পুকুরে যাচ্ছি দেখি বারান্দার ওপর সবাই জড় হয়ে কথাবার্তা হচ্ছে! কাছে এসে দাঁড়ালুম, মাছ কোটা হয়ে গেছে। মেজজা তরকারি কুটছেন, শাশুড়ী বলে বলে দিচ্ছেন ; এটা মাছের ঝোলের কুটনো, ওটা মাঝের ডালনার কুটনো, ওটা মাছের অম্বলের কুটনো, এমনই সমস্তই প্রায় আঁশ রান্না। আজ একাদশী, তাঁর এবং বিধবা মেয়ের খাবার হাঙ্গামা নেই, কিন্তু আমার স্বামীর জন্যে কোন ব্যবস্থাই দেখলুম না। তিনি বৈষ্ণবমানুষ, মাছ, মাংস, ছুঁতেন না। একটু ডাল, দুটো ভাজাভুজি, একটুখানি অম্বল হলেই তাঁর খাওয়া হত। অথচ ভাল খেতেও তিনি ভালবাসতেন। এক-আধদিন একটু ভাল তরকারি হলে তাঁর আহ্লাদেওর সীমা থাকত না, তাও দেখেচি।

বললুম, ওঁর জন্যে কি হচ্ছে মা ?

শাশুড়ী বললেন, আজ আর সময় কৈ বৌমা ? ওর জন্যে দুটো আলু-উচ্ছে ভাতে দিতে বলে দিয়েচি, তার পর একটু দুধ দেব'খন!

বললুম, সময় নেই কেন মা ?

শাশুড়ী বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখতেই তো পাচ্ছ বৌমা! এতগুলো আঁশ-রান্না হতেই ত দশটা-এগারোটা বেজে যাবে। আজ আমার অখিলের (মেজদেওর) দু-চারজন বন্ধুবান্ধব খাবে, তারা হ'ল সব অফিসার মানুষ, দশটার মধ্যে খাওয়া না হলে পিত্তি পড়ে সারাদিন আর খাওয়াই হবে না। এর উপর আবার নিরামিষ রান্না করতে গেলে ত রাঁধুনী বাঁচে না। তার

প্রাণটাও ত দেখতে হবে বাছা!

রাগে সর্বাঙ্গ রি-রি করে জ্বলতে লাগল। তবু কোনমতে আত্মসংবরণ করে বললুম, শুধু আলু-উচ্ছে-ভাতে দিয়ে কি কেউ খেতে পারে? একটুখানি ডাল রাঁধবারও কি সময় হ'ত না?

তিনি আমার মুখের পানে কটমট করে চেয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারিনে বাছা, আমার কাজ আছে।

এতক্ষণ রাগ সামলেছিলুম, আর পারলুম না। বলে ফেললুম, কাজ সকলেরি আছে মা! তিনি তিরিশ টাকার কেরানীগিরি করেন না বলে, কুলি-মজুর বলে তোমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারো। কিন্তু আমি ত পারিনে। আমি ওই দিয়ে তাঁকে খেতে দেব না। রাঁধুনী রাঁধতে না পারে, আমি যাচ্ছি।

শাশুড়ী খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে বললেন, তুমি ত কাল এলে বৌমা, এতদিন তার কি করে খাওয়া হ'ত শুনি?

বললুম সে খোঁজে আমার দরকার নেই। কিন্তু কাল এলেও আমি কচি খুকী নই মা! এখন থেকে সে-সব হতে দিতে পারব না। রান্নাঘরে ঢুকে রাঁধুনীকে বললুম, বড়বাবুর জন্যে নিরামিষ ডাল, ডালনা, অম্বল হবে। তুমি না পার, একটা উনুন ছেড়ে দাও, আমি এসে রাঁধচি, বলে আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না করে স্নান করতে চলে গেলুম।

স্বামীর বিছানা আমি রোজ নিজের হাতেই করতুম। এই ধপধপে সাদা বিছানাটার উপর ভেতরে ভেতরে যে একটা লোভ জন্মাচ্ছিল, হঠাৎ এতদিন পর আজ বিছানা করবার সময় সে কথা জানতে পেরে নিজের কাছেই যেন লজ্জায় মরে গেলুম।

ঘড়িতে বারোটা বাজতে তিনি শুতে এলেন। কেন যে এত রাত পর্যন্ত জেগে বসে বই পড়ছিলুম, তাঁর পায়ের শব্দ সে খবর আজ এমনি স্পষ্ট করে আমার কানে কানে বলে দিল যে, লজ্জায় মুখ তুলে চাইতেও পারলাম না।

স্বামী বললেন, এখনো শোওনি যে?

আমি বই থেকে মুখ তুলে ঘড়ির পানে তাকিয়ে যেন চমকে উঠলুম— তাইত, বারোটা বেজে গেছে।

কিন্তু যিনি সব দেখতে পান, তিনি দেখেছিলেন, আমি পাঁচ মিনিট অন্তর ঘড়ি দেখেচি।

স্বামী শয্যায় বসে একটু হেসে বললেন, আজ আবার কি হাঙ্গামা বাধিয়েছিলে ?

বললুম, কে বললে ?

তিনি বললেন, সেদিন তোমাকে ত বলেচি, আমি হাত গুণতে জানি।

বললুম, জানলে ভালই ! কিন্তু তোমার গোয়েন্দার নাম না বল, তিনি কি কি দোষ আমার দিলেন শুনি ?

তিনি বললেন, গোয়েন্দা দোষ দেয়নি. কিন্তু আমি দিচ্চি। আচ্ছা জিজ্ঞেসা করি, এত অল্পে তোমার এত রাগ হয় কেন ?

বললাম, অল্প ? তুমি কি ভাবো, তোমাদের ন্যায়-অন্যায়ের বাটখারা দিয়েই সকলের ওজন চলবে ? কিন্তু তাও বলচি. তুমি যে এত বলচ, এত অত্যাচার চোখে দেখলে তোমারও রাগ হত।

তিনি আবার একটু হাসলেন, বললেন, আমি বোষ্টম, আমায় ত নিজের উপর অত্যাচারে রাগ করতে নেই। মহাপ্রভু আমাদেব গাছের মত সহিষ্ণু হতে বলেছেন, আর তোমাকে এখন থেকে তাই হতে হবে।

কেন, আমার অপরাধ ?

বৈষ্ণবের স্ত্রী, এইমাত্র তোমার অপরাধ।

বললাম, তা হতে পারে, কিন্তু গাছের মত অন্যায় সহ্য করা আমার কাজ নয়, তা সে যে প্রভুই আদেশ করুন। তা ছাড়া যে লোক ভগবান পর্যন্ত মানে না, তার কাছে আবার মহাপ্রভু কি ?

স্বামী হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন, বললেন, কে ভগবান মানে না ? তুমি ?

বললাম, হাঁ, আমি।

তিনি বললেন, ভগবান মান না কেন ?

বললুম, নেই বলে মানিনে। মিথ্যে বলে মানিনে।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছিলুম, আমার স্বামীর হাসিমুখখানি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছিল, এই কথার পর সে মুখ একেবারে যেন ছাই-এর মত সাদা হয়ে গেল। একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, শুনেছিলাম তোমার মামা নাকি নিজেকে নাস্তিক বলতেন—

আমি মাঝখানে ভুল শুধরে দিয়ে বললুম, তিনি নিজেকে নাস্তিক বলতেন না, Agnostic বলতেন।

স্বামী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সে আবার কি ?

আমি বললাম, Agnostic তারা, যারা ঈশ্বর আছেন না নেই কোন কথাই বলে না।

কথাটা শেষ না হতেই স্বামী বলে উঠলেন, থাক এসব আলোচনা। আমার সামনে তুমি কোনদিন আর এ কথা মুখে এনো না।

তবু তর্ক করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখপানে চেয়ে আর আমার মুখে কথা যোগাল না। ভগবানের ওপর তাঁর অচল বিশ্বাস আমি জানতুম, কিন্তু কোন মানুষ যে আর একজনের মুখ থেকে তাঁর অস্বীকার শুনলে এত ব্যথা পেতে পারে, এ ধারণাই আমার ছিল না। এই নিয়ে মামার বসবার ঘরে অনেক তর্ক নিজেও করেচি, অপরকেও করতে শুনেচি, রাগারাগি হয়ে যেতে বহুবার দেখেচি, কিন্তু এমন বেদনায় বিবর্ণ হয়ে যেতে কাউকে দেখিনি। আমি নিজেও ব্যথা বড় কম পেলুম না, কিন্তু কোন তর্ক না করে এভাবে আমার মুখ বন্ধ করে দেওয়ার অপমানে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কিন্তু ভাবি, আমার অপমানের পালাটা এর ওপর দিয়েই কেন সেদিন শেষ হলনা।

যে মাদুরটা পেতে আমি নীচে শুতুম, সেটা ঘরের কোণে গুটানো থাকত; আজ কে সরিয়ে রেখেছিল বলতে পারিনে। খুঁজে পাচ্ছিনে দেখে, তিনি নিজে বিছানা থেকে একটা তোশক তুলে বললেন, আজ এইটে পেতে শোও। এত রাত্রে কোথা আর খুঁজে বেড়াবে বল?

তাঁর কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের লেশমাত্র ছিল না। তবুও কথাটা যেন অপমানের শূল হয়ে আমার বুকে বিঁধল। রোজ ত আমি নীচেই শুই। সামান্য একখানা মাদুর পেতে যেমন-তেমন ভাবে রাত্রি যাপন করাটাই ত ছিল আমার সবচেয়ে বড় গর্ব। কিন্তু স্বামীর ছোট দুটি কথায় যে আজ আমার সেই গর্ব ঠিক তত বড় লাঞ্ছনায় রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেবে, এ কে ভেবেছিল?

অন্যত্র শোবার উপকরণ স্বামীর হাত থেকেই হাত পেতে নিলুম, কিন্তু শোবা-মাত্রই কান্নার ঢেউ যেন আমার গলা পর্যন্ত ফেনিয়ে উঠল। জানিনে, তিনি শুনতে পেয়েছিলেন কি না। সকাল হতে না হতেই তাড়াতাড়ি বিছানা তুলে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করচি, তিনি ডেকে বললেন, আজ এত ভোরে উঠলে যে?

বললুম, ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাই বাইরে যাচ্ছি।

বললেন, একটা কথা আমার শুনবে?

রাগে, অভিমানে সর্বাঙ্গ ভরে গেল, বললুম, তোমার কথা কি আমি

শুনিনি ?

আমার মুখপানে চেয়ে তিনি একটু হেসে বললেন, শোন, আচ্ছা, তা হলে কাছে এস, বলি।

বললুম, আমি ত কালা নই, এখানে দাঁড়িয়েই শুনতে পাব।

পাবে না গো পাবে না, বলেই হঠাৎ তিনি সুমুখে ঝুঁকে পড়ে আমার হাতটা ধরে ফেললেন। আমি জোর করে ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে পারব কেন, একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে হাত দিয়ে জোর করে আমার মুখ তুলে ধরে বললেন, যারা ভগবান মানে, তারা কি বলে জান ? তারা বলে, স্বামীর কাছে কিছুতেই মিথ্যে বলতে নেই।

আমি বললুম, কিন্তু যারা ভগবান মানে না, তারা বলে, কারও কাছে মিথ্যে বলতে নেই।

স্বামী হেসে বললেন বটে! কিন্তু তাই যদি হয়, অতবড় মিথ্যে কথাটা কাল কি করে মুখে আনলে বল ত ? কি করে বললে ভগবান তুমি মান না ?

হঠাৎ মনে হ'ল, এত আশা করে কেউ বুঝি কখনো কারও সঙ্গে কথা কয়নি। তাই বলতে মুখে বাধতে লাগল, কিন্তু তবু ত পোড়া অহঙ্কার গেল না, বলে ফেললুম, ভগবান মানি বললেই বুঝি সত্য কথা বলা হ'ত ? আমাকে আটকে রাখলে কেন ? আর কোন কথা আছে ?

তিনি ম্লানমুখে আস্তে আস্তে বললেন, আর একটা কথা, মায়ের কাছে আজ মাপ চেয়ো।

আমার সর্বাঙ্গ রাগে জলে উঠল ; বললুম, মাপ চাওয়াটা কি ছেলেখেলা, না তার কোন অর্থ আছে ?

স্বামী বললেন, অর্থ তার এই যে, সেটা তোমার কর্তব্য।

বললুম, তোমাদের ভগবান বুঝি বলেন, যে নিরপরাধ, সে গিয়ে অপরাধীর নিকট ক্ষমা চেয়ে কর্তব্য করুক ?

স্বামী আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার মুখের পানে খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেন। তার পরে ধীরে ধীরে বললেন, ভগবানের নাম নিয়ে তামাশা করতে নেই, এ কথা ভবিষ্যতে কোনদিন আর যেন মনে করে দিতে আমায় না হয়। আমি তর্ক করতে ভালবাসি নে—মায়ের কাছে মাপ চাইতে না পার, তাঁর সঙ্গে আর কখনও বিবাদ করতে যেও না।

বললুম কেন, শুনতে পাইনে ?

তিনি বললেন, না। নিষেধ করা আমার কর্তব্য, তাই নিষেধ করে দিলুম। এই বলে তিনি বাইরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন!

আমি আর সইতে পারলুম না, বললাম, কর্তব্যজ্ঞানটা তোমাদের যদি এত বেশী, সে কি আর কারও নেই? আমিও ত মানুষ, বাড়ির মধ্যে আমারও ত একটা কর্তব্য আছে। তা যদি তোমাদের ভাল না লাগে, আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। থাকলেই বিবাদ হবে, এ নিশ্চয় বলে দিচ্ছি।

তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, তা হলে গুরুজনের সঙ্গে বিবাদ করাই বুঝি তোমার কর্তব্য? সে যদি হয়, যেদিন ইচ্ছে বাপের বাড়ি যাও, আমাদের কোন আপত্তি নেই।

স্বামী চলে গেলেন, আমি সেইখানেই ধপ করে বসে পড়লুম। মুখ দিয়ে শুধু আমার বার হ'ল, হায় রে। যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!

সমস্ত সকালটা যে আমার কি করে কাটল, সে আমিই জানি। কিন্তু দুপুরবেলা স্বামীর মুখ থেকেই যে কথা শুনলাম তাতে বিস্ময়ের আর অবধি রইল না।

খেতে বসিয়ে শাশুড়ী বললেন, কাল তোমাকে বলিনি বাছা, কিন্তু এ বৌ নিয়ে ত আমি ঘর করতে পারিনে ঘনশ্যাম! কালকের কাণ্ড ত শুনেচ?

স্বামী বললেন, শুনেচি মা।

শাশুড়ী বললেন, তা হলে যা হোক এর একটা ব্যবস্থা কর।

স্বামী একটুখানি হেসে বললেন, ব্যবস্থা করার মালিক ত' তুমি নিজেই মা।

শাশুড়ী বললেন, তা কি আর পারিনে বাছা, একদিনেই পারি। এতবড় ধাড়ী মেয়ে, আমার ত বিয়ে দিতেই ইচ্ছে ছিল না। শুধু—

স্বামী বললেন, সে কথা ভেবে আর লাভ কি মা! আর ভালোমন্দ যাই হোক বাড়ির বড়বৌকে ত আর ফেলতে পারবে না? ও চায়, আমি একটু ভাল খাই-দাই। ভাল, সে ব্যবস্থাই কেন করে দাও না মা!

শাশুড়ী বললেন, অবাক করলি ঘনশ্যাম! আমি কি ভালোমন্দ খেতে দিতে জানিনে যে আজ ও এসে আমাকে শিখিয়ে দেবে? আর তোমারই বা দোষ কি বাবা! অতবড় বৌ যেদিন এসেছে, সেই দিনই জানতে পেরেচি, সংসার এবার ভাঙ্গল। তা বাছা, আমার গিন্নীপনায় আর না যদি চলে, ওর হাতেই না হয় ভাঁড়ারের চাবি দিচ্চি। কৈ গা বড়বৌমা, বেরিয়ে এস গো, চাবি নিয়ে যাও! বলে শাশুড়ী ঝনাৎ করে চাবির গোছাটা রান্নাঘরের

দাওয়ার উপর ফেলে দিলেন।

স্বামী আর একটি কথাও কইলেন না ; মুখ বুজে ভাত খেয়ে বাইরে যাবার সময় বলতে বলতে গেলেন, সব মেয়েমানুষের ঐ এক রোগ, কাকেই বা কি বলি !

আমার বুকের মধ্যে যেন আহ্লাদের জোয়ার ডেকে উঠল ; আমি যে কেন ঝগড়া করেছি, তা উনি জানতে পেরেছেন, এই কথাটা শতবার মুখে আবৃত্তি করে সহস্র রকমে মনের মধ্যে অনুভব করতে লাগলুম। সকালের সমস্ত ব্যথা আমার যেন ধুয়ে মুছে গেল।

এখন কতবার মনে হয়, ছেলেবেলা থেকে কাজের অকাজের কত বই পড়ে কত কথাই শিখেছিলুম, কিন্তু এ কথাটা কোথাও যদি শিখতে পেতুম, পৃথিবীতে তুচ্ছ একটি কথা গুছিয়ে না বলবার দোষে, ছোট একটি কথা মুখ ফুটে না বলবার অপরাধে, কত শত ঘর-সংসারই না ছারখার হয়ে যায়। হয়ত, তা হলে এ কাহিনী লেখবার আজ আবশ্যকই হ'ত না।

তাইত, বার বার বলি, ওরে হতভাগী ! এত শিখেছিলি, এটা শুধু শিখিস নি, মেয়েমানুষের কার মানে মান ! কার হতাদরে তোদের মানের অট্টালিকা তাসের অট্টালিকার মতই এক নিমিষে একটা ফুঁয়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায় !

তবে তোর কপাল পুড়বে না ত পুড়বে কার ? সমস্ত সন্ধ্যাবেলাটা ঘরে খিল দিয়ে যদি সাজসজ্জাই করলি, অসময়ে ঘুমের ভান করে যদি স্বামীর পালঙ্কের একধারে গিয়ে শুতেই পারলি, তাঁকে একটা সাড়া দিতেই কি তোর এমন কণ্ঠরোধ হ'ল ! তিনি ঘরে ঢুকে দ্বিধায় সঙ্কোচে বার বার ইতস্ততঃ করে যখন বেরিয়ে গেলেন, একটা হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতটা ধরে ফেলতেই কি তোর হাতে পক্ষাঘাত হ'ল ? সেই ত সারারাত্রি ধরে মাটিতে পড়ে পড়ে কাঁদলি, একবার মুখ ফুটে বলতেই কি শুধু এত বাধা হ'ল যে, আচ্ছা, তুমি তোমার বিছানাতে এসে শোও,আমি আমার ভূমিশয্যাতে না হয়ফিরে যাচ্ছি।

অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙ্গল, মনে হ'ল যেন জ্বর হয়েচে। উঠে বাইরে যাচ্চি, স্বামী এসে ঘরে ঢুকলেন। আমি মুখ নীচু করে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলুম, তিনি বললেন, তোমাদের গ্রামের নরেনবাবু এসেছেন।

বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল।

স্বামী বলতে লাগলেন, আমাদের নিখিলের তিনি কলেজের বন্ধু। চিতোর

বিলে হাঁস শিকার করবার জন্ত কলকাতায় থাকতে সে বুঝি কবে নেমন্তন্ন করে এসেছিল, তাই এসেছেন। তুমিও তাঁকে বেশ চেন, না?

উঃ, মানুষের স্পর্ধার কি একটা সীমা থাকতে নেই!

ঘাড় নেড়ে জানালুম, আছে। কিন্তু ঘৃণায় লজ্জায় নখ থেকে চুল পর্যন্ত আমার তেতো হয়ে গেল।

স্বামী বললেন, তোমার প্রতিবেশীর আদর-যত্নের ভার তোমাকেই নিতে হবে।

শুনে এমনি চমকে উঠলুম যে, ভয় হ'ল, হয়ত আমার চমকটা তাঁর চোখে পড়েচে। কিন্তু এদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। বললেন, কাল রাত্রি থেকেই মায়ের বাতটা ভয়ানক বেড়েচে। এদিকে নিখিলও বাড়ি নেই, অখিলকেও তার আপিস করতে হবে।

মুখ নীচু করে কোন মতে বললুম, তুমি?

আমার কিছুতেই থাকবার জো নেই। রায়গঞ্জে পাট কিনতে না গেলেই নয়।

কখন ফিরবে?

ফিরতে আবার কাল এই সময়। রাত্রিটা সেইখানেই থাকতে হবে।

তা হলে আর কোথাও তাঁকে যেতে বল। আমি বৌ-মানুষ, শ্বশুরবাড়িতে তাঁর সামনে বার হতে পারব না।

স্বামী বললেন, ছি, তা কি হয়। আমি সমস্ত ঠিক করে দিয়ে যাচ্ছি, তুমি সামনে না বার হও, আড়াল থেকে গুছিয়ে-গাছিয়ে দিয়ো। এই বলে তিনি বাইরে চলে গেলেন।

সেইদিন পাঁচ মাস পরে আবার নরেনকে দেখলুম। দুপুরবেলা সে খেতে বসেছিল, আমি রান্নাঘরের দোরের আড়ালে বসে কিছুতেই চোখের কৌতূহল থামাতে পারলুম না। কিন্তু চাইবামাত্রই আমার সমস্ত মনটা এমন একপ্রকার বিতৃষ্ণায় ভরে গেল যে, সে পরকে বোঝানো শক্ত; মস্ত একটা তেতুলবিছে এঁকে বেঁকে চলে যেতে দেখলে সর্বাঙ্গ যেমন করে ওঠে, অথচ যতক্ষণ সেটা দেখা যায়, চোখ ফিরুতে পারা যায় না, ঠিক তেমনি করে আমি নরেনের পানে চেয়ে রইলুম। ছি, ছি, ওর ওই দেহটাকে কি করে যে একদিন ছুঁয়েছি, মনে পড়তেই সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে মাথার চুল পর্যন্ত আমার খাড়া হয়ে উঠল।

খেতে খেতে সে মাঝে মাঝে চোখ তুলে চারিদিকে কি যে খুঁজছিল, সে

আমি জানি। আমাদের রাঁধুনী কি একটা তরকারি দিতে গেল,সে হঠাৎভারী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ গা, তোমাদের বড়বৌ যে বড় বেরুলো না।

রাঁধুনী জানত যে, ইনি আমাদের বাপের বাড়ির লোক—গ্রামের জমিদার। তাই বোধ করি খুশী করবার জন্তেই হাসির ভঙ্গীতে একঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে তার মন যোগালে। বললে, কি জানি বাবু, বড়বৌমার ভারী লজ্জা, নইলে তিনিই ত আপনার জন্তে আজ নিজে রাঁধলেন। রান্নাঘরে বসে তিনিই ত আপনার সব খাবার এগিয়ে গুছিয়ে দিলেন। লজ্জা করে কিন্তু কম-সম খাবেন না বাবু, তা হলে তিনি বড় রাগ করবেন, আমাকে বলে দিলেন।

মানুষের শয়তানির অন্ত নেই, দুঃসাহসেরও অবধি নেই। সে স্বচ্ছন্দে স্নেহের হাসিতে মুখখানা রান্নাঘরের দিকে তুলে চেঁচিয়ে বললে, আমার কাছে তোর আবার লজ্জা কি রে সদু? আয়, আয়, বেরিয়ে আয়। অনেকদিন দেখিনি, একবার দেখি?

কাঠ হয়ে সেই দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার মেজজাও রান্নাঘরে ছিল, ঠাট্টা করে বললে, দিদির সবটাতেই বাড়াবাড়ি। পাড়ার লোক, ভাইয়ের মত, বিয়ের দিন পর্যন্ত সামনে বেরিয়েচ, কথা কয়েচ, আর আজই যত লজ্জা! একবার দেখতে চাচ্চেন, যাও না।

এর আর জবাব দেব কি?

বেলা তখন দুটো-আড়াইটে, বাড়ির সবাই যে যার ঘরে শুয়েচে, চাকরটা এসে বাইরে থেকে বলল, বাবু পান চাইলেন মা।

কে বাবু?

নরেনবাবু।

তিনি শিকার করতে যাননি?

কৈ না, বৈঠকখানায় শুয়ে আছেন যে।

তা হলে শিকারের ছলটাও মিথ্যে।

পান পাঠিয়ে দিয়ে জানলায় এসে বসলুম। এ বাড়িতে আসা পর্যন্ত এই জানালাটিই ছিল সবচেয়ে আমার প্রিয়। নীচেই ফুলবাগান, একঝাড় চামেলি ফুলের গাছ দিয়ে সম্মুখটা ঢাকা; এখানে বসলে বাইরের সমস্ত দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না।

আমি মানুষের এই বড় একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখি যে, যে বিপদটা হঠাৎ তার ঘাড়ে এসে পড়ে তাকে একান্ত অস্থির ও উদ্বিগ্ন করে দিয়ে যায়, অনেক সময়ে সে তাকেই একপাশে ঠেলে দিয়ে একটা তুচ্ছ কথা চিন্তা করতে বসে যায়। বাইরে পান পাঠিয়ে দিয়ে আমি নরেনের কথাই ভাবতে বসেছিলুম সত্যি, কিন্তু কখন কোন্ ফাঁকে যে আমার স্বামী এসে আমার সমস্ত মন জুড়ে বসে গিয়েছিলেন, সে আমি টেরও পাইনি।

আমার স্বামীকে আমি যত দেখছিলুম ততই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলুম, সবচেয়ে আশ্চর্য হ'তুম—তাঁর ক্ষমা করবার ক্ষমতা দেখে। আগে আগে মনে হ'ত, এ তাঁর দুর্বলতা, পুরুষত্বের অভাব। শাসন করবার সাধ্য নেই বলেই ক্ষমা করেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল, ততই টের পাচ্ছিলুম। তিনি যেমন বুদ্ধিমান তেমনি দৃঢ়। আমাকে যে তিনি ভেতরে ভেতরে কত ভালবেসেচেন, সে ত আমি অসংশয়ে অনুভব করতে পারি, কিন্তু সে ভালবাসার ওপর এতটুকু জোর খাটাবার সাহস আমার ত হয় না।

একদিন কথায় কথায় বলেছিলুম, আচ্ছা, তুমিই বাড়ির সর্বস্ব, কিন্তু তোমাকে যে বাড়িসুদ্ধ সবাই অযত্ন অবহেলা করে, এমন কি অত্যাচার করে, এ কি তুমি ইচ্ছা করলে শাসন করে দিতে পার না?

তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, কৈ কেউ ত অযত্ন করে না!

কিন্তু আমি নিশ্চয় জানতুম, কিছুই তাঁর অবিদিত ছিল না। বললুম, আচ্ছা, যত বড় দোষই হোক, তুমি কি সব মাপ করতে পার?

তিনি তেমনি হাসিমুখে বললেন, যে সত্যি ক্ষমা চায়, তাকে করতেই হবে, এ যে আমাদের মহাপ্রভুর আদেশ গো!

তাই এক-একদিন চুপ করে বসে ভাবতুম, ভগবান যদি সত্যি নেই, তা হলে এত শক্তি, এত শান্তি ইনি পেলেন কোথায়? এই যে আমি স্ত্রীর কর্তব্য একদিনের জন্যে করিনে, তবু ত তিনি কোনদিন স্বামীর জোর নিয়ে আমায় অমর্যাদা অপমান করেন না।

আমাদের ঘরের কুলুঙ্গিতে একটি শ্বেত-পাথরের গৌরাঙ্গমূর্তি ছিল, আমি কত রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখেচি, স্বামী বিছানার উপর স্তব্ধ হয়ে বসে একদৃষ্টে তাঁর পানে চেয়ে আছেন, আর দু' চক্ষু বয়ে অশ্রুর ধারা বয়ে যাচ্ছে। সময়ে সময়ে তাঁর মুখ দেখে আমারও যেন কান্না আসত, মনে হত, অমনি করে একটা দিনও কাঁদতে পারলে বুঝি মনের অর্ধেক বেদনা কমে যাবে। পাশের

কুলুঙ্গিতে তাঁর খান-কয়েক বড় আদরের বই ছিল, তাঁর দেখাদেখি আমিও মাঝে মাঝে পড়তুম। লেখাগুলো যে আমি সত্যি বলে বিশ্বাস করতুম, তা নয়, তবুও এমন কতদিন হয়েছে, কখন পড়ায় মন লেগে গেছে, কখন বেলা বয়ে গেছে, কখন দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে গালের উপর শুকিয়ে আছে, কিছুই ঠাওর পাইনি। কতদিন হিংসে পর্যন্ত হয়েছে, তাঁর মত আমিও যদি এগুলি সমস্ত সত্যি বলেই ভাবতে পারতুম!

কিছুদিন পরে আমি বেশ টের পেতুম, কি একটা ব্যথা যেন প্রতি আমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কেন, কিসের জন্য, তা কিছুতেই হাতড়ে পেতুম না। শুধু মনে হ'ত আমার যেন কেউ কোথাও নেই। ভাবতুম, মায়ের জন্যেই বুঝি ভেতরে ভেতরে মন কেমন করে, তাই কতদিন ঠিক করেচি, কালই পাঠিয়ে দিতে বলব, কিন্তু যেই মনে হ'ত, এই ঘরটি ছেড়ে আর কোথাও যাচ্ছি, না—অমনি সমস্ত সঙ্কল্প কোথায় যে ভেসে যেত, তাঁকে মুখ ফুটে বলাও হ'ত না।

মনে করলুম, যাই, কুলুঙ্গি থেকে বইখানা এনে একটু পড়ি। আজকাল এই বইখানা হয়েছিল আমার অনেক দুঃখের সান্ত্বনা। কিন্তু উঠতে গিয়ে হঠাৎ আঁচলে একটা টান পড়তেই ফিরে চেয়ে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস হ'ল না। দেখি, আমার আঁচল ধরে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে নরেন। একটু হলেই চেঁচিয়ে ফেলেছিলুম আর কি! সে কখন এসেচে, কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কিছুই জানতে পারিনি। কিন্তু কি করে যে সেদিন আপনাকে সামলে ফেলেছিলুম, আমি আজও ভেবে পাইনে। ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম এখানে এসেচ কেন? শিকার করতে?

নরেন বললে, বস বলচি।

আমি জানালার ওপর বসে পড়ে বললুম, শিকার করতে যাওনি কেন?

নরেন বললেন, ঘনশ্যামবাবুর হুকুম পাইনি। যাবার সময় বলে গেলেন, আমরা বৈষ্ণব, আমাদের বাড়ি থেকে জীবহত্যা করা নিষেধ।

চক্ষের নিমেষে স্বামী-গর্বে আমার বুকখানা ফুলে উঠল। তিনি কোন কর্তব্য ভোলেন না, সেদিকে তাঁর একবিন্দু দুর্বলতা নেই। মনে মনে ভাবলুম, এ লোকটা দেখে যাক, আমার স্বামী কত বড়!

বললুম, তা হলে বাড়ি ফিরে গেলে না কেন?

সে লোকটা গরাদের ফাঁক দিয়ে খপ করে আমার হাতটা চেপে ধরে বললে,

সদু, টাইফয়েড জ্বরে মরতে মরতে বেঁচে উঠে যখন শুনলাম তুমি পরের হয়েচ, আর আমার নেই, তখন বার বার বললুম, ভগবান, আমাকে বাঁচালে কেন? তোমার কাছে আমি এইটুকু বয়সের মধ্যে এমন কি পাপ করেচি; যার শাস্তি দেবার জন্যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে!

বললুম, তুমি ভগবান মান?

নরেন থতমত খেয়ে বলতে লাগল, না হাঁ, না, মানিনে, কিন্তু সে সময়ে— কি জান!

থাক গে, তার পরে?

নরেন বলে উঠল, উঃ, সে আমার কি দিন, যেদিন শুনলুম, তুমি আমারই আছ, শুধু নামে অন্যের, নইলে, আমারই চিরকাল, শুধু আমারই! আজও একদিনের জন্য আর কারও শয্যায় রাত্রি—

ছি ছি, চুপ কর! কিন্তু কে তোমাকে এ খবর দিলে। কার কাছে শুনলে?

তোমাদের যে দাসী তিন-চারদিন হ'ল বাড়ি যাবার নাম করে চলে গেছে, যে—

মুক্ত কি তোমার লোক ছিল? বলে জোর করে তার হাত ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু এবারেও সে তেমনি সজোরে ধরে রাখলে। তার চোখ দিয়ে ফোঁটা-দুই জলও গড়িয়ে পড়ল। বললে, সদু, এমনি করেই কি আমাদের জীবনের শেষ হবে? অমন অসুখে না পড়লে আজ কেউ ত আমাদের আলাদা করে রাখতে পারত না! যে অপরাধ আমার নিজের নয়, তার জন্য কেন এতবড় শাস্তি ভোগ করব? লোকে ভগবান ভগবান করে, কিন্তু তিনি সত্যি থাকলে কি বিনাদোষে এতবড় সাজা আমাদের দিতেন? তুমিই বা কিসের জন্য একজন অজানা-অচেনা মুখ্যু লোকের—

থাক, থাক, ও-কথা থাক!

নরেন চমকে উঠে বললে, আচ্ছা থাক, কিন্তু যদি জানতুম, তুমি সুখে আছ, সুখী হয়েছ, তা হলে হয়ত একদিন মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতুম, কিন্তু কোন সম্বলই যে আমার হাতে নেই, আমি বাঁচব কি করে?

আবার তার চোখে জল এসে পড়ল। এবার সে আমার হাতটাই টেনে নিয়ে তার নিজের চোখের জল মুছে বললে, এমন কোন সভ্য দেশ পৃথিবীতে আছে—যেখানে এতবড় অন্যায় হতে পারত! মেয়েমানুষ বলে কি তার প্রাণ

নেই, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়ে এমন করে তাকে সারা জীবন দগ্ধ করবার অধিকার সংসারে কার আছে? কোন্ দেশের মেয়েরা ইচ্ছা করলে এমন বিয়ে লাথি মেরে ভেঙ্গে দিয়ে যেখানে খুশি চলে যেতে না পারে?

এসব কথা আমি সমস্তই জানতুম। আমার মামার ঘরে নব্য-যুগের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কোন আলোচনাই বাকী ছিল না। আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন দুলতে লাগল। বললুম, তুমি আমাকে কি করতে বল?

নরেন বললে, আমি তোমাকে কোন কথাই বলব না। এইটুকু শুধু জানিয়ে যাব যে, মরণের গ্রাস থেকে উঠে পর্যন্ত আমি এই আজকের দিনের প্রতীক্ষা করেই পথ চেয়েছিলুম! তার পরে হয়ত একদিন শুনতে পাবে, যেখান থেকে উঠে এসেচি, তার কাছেই ফিরে চলে গেছি। কিন্তু তোমার কাছে এই আমার শেষ নিবেদন রইল সদু, বেঁচে থাকতে যখন কিছুই পেলুম না, মরণের পরে যেন ঐ চোখের দু' ফোঁটা জল পাই। আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, তার তাতেই তৃপ্তি হবে।

আমার হাতটা তার হাতের মধ্যেই রইল, চুপ করে বসে রইলুম। এমন ভাবি, সেদিন যদি ঘুণাগ্রেও জানতুম, মানুষের মনের দাম এই, একেবারে উলটো ধারায় বইয়ে দিতে এইটুকুমাত্র সময় এইটুকুমাত্র মাল-মসলার প্রয়োজন, তা হলে যেমন করে হোক, সেদিন তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জানালা বন্ধ করে দিতুম, কিছুতেই তার একটা কথাও কানে ঢুকতে দিতুম না। ক'টা কথা, ক'ফোঁটা চোখের জলই বা তার খরচ হয়েছিল? কিন্তু নদীর প্রচণ্ড স্রোতে পাতাসুদ্ধ শরগাছ যেমন করে কাঁপতে থাকে, তেমনি করে আমার সমগ্র দেহটা কাঁপতে লাগল, মনে হতে লাগল, নরেন যেন কোন অদ্ভুত কৌশলে আমার পাঁচ আঙুলের ভিতর দিয়ে পাঁচ শ বিদ্যুতের ধারা আমার সর্বাঙ্গে বইয়ে দিয়ে আমার পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত অবশ করে আনচে। সেদিন মাঝখানের সেই লোহার গরাদগুলো যদি না থাকত, আর সে যদি আমাকে টেনে তুলে নিয়ে পালাত, হয়ত আমি একবার চেঁচাতে পর্যন্ত পারতুম না—ওগো, কে আছ আমায় রক্ষা করো!

দু'জনে কতক্ষণ এমন স্তব্ধ হয়েছিলুম জানিনে, সে হঠাৎ বলে উঠল, সদ্!

কেন?

তুমি ত বেশ জান, আমাদের মিথ্যে শাস্ত্রগুলো শুধু মেয়েমানুষকে বেঁধে রাখবার শেকল মাত্র! যেমন করে হোক আটকে রেখে তাদের সেবা নেবার

ফন্দি ? সতীর মহিমা কেবল মেয়েমানুষের বেলায়, পুরুষের বেলায় সব ফাঁকি। আত্মা আত্মা যে করে, সে কি মেয়েমানুষের দেহে নেই ? তার কি স্বাধীন সত্তা নেই ? সে কি শুধু এসেছিল পুরুষের সেবাদাসী হবার জন্যে ?

বৌমা, বলি কথা তোমাদের শেষ হবে না বাছা ?

মাথার ওপর বাজ ভেঙ্গে পড়লেও বোধ করি মানুষের এমন করে চমকে ওঠে না, আমরা দু'জনে যেমন করে চমকে উঠলুম, নরেন হাত ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ল, আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, বারান্দায় খোলা জানালার ঠিক সুমুখে দাঁড়িয়ে আমার শাশুড়ী।

বললেন, বাছা, এ পাড়ার লোকগুলো ত তেমন সভ্য-ভব্য নয়, অমন করে ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করতে দেখলে হয়ত বা দোষের ভেবে নেবে। বলি, বাবুটিকে ঘরে ডেকে পাঠালেই ত দেখতে শুনতে সবদিকে বেশ হ'ত।

কি একটা জবাব দিতে গেলুম, কিন্তু মুখের মধ্যে জিভটা আমার আড়ষ্ট রইল, একটা কথাও ফুটল না।

তিনি একটুখানি হেসে বললেন, বলতে পারিনে বাছা, শুধু ভেবেই মরি, বৌমাটি কেন আমার এত কষ্ট সয়ে মাটিতে শুয়ে থাকেন! তা বেশ! বাবুটি নাকি দুপুরবেলা চা খান! চা তৈরীও হয়েছে, একবার মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর দেখি বৌমা, চায়ের পিয়ালাটা বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দেব, না ঐ বাগানে দাঁড়িয়ে খাবেন ?

উঠে দাঁড়িয়ে প্রবল চেষ্টায় তবে কথা কইতে পারলুম, বললুম, তুমি কি রোজ এমনি করে আমার ঘরে আড়ি পাত মা ?

শাশুড়ী মাথা নেড়ে বললেন, না না, সময় পাই কোথা ? সংসারের কাজ করেই ত সারতে পারিনি। এই দেখ না বাছা, বাতে মরচি, তবু চা তৈরী করতে রান্নাঘরে ঢুকতে হয়েছিল। তা এ ঘরেই না হয় পাঠিয়ে দিচ্ছি, বাবুটির আবার ভারী লজ্জার শরীর, আমি থাকতে হয়ত খাবেন না। তা যাচ্ছি আমি—, বলে তিনি ফিক করে একটু মুচকে হেসে চলে গেলেন। এমনি মেয়েমানুষের বিদ্বেষ! প্রতিশোধ নেবার বেলায় শাশুড়ী-বধুর মানা মান্য সম্বন্ধের কোন উঁচু-নীচুর ব্যবধানই রাখলেন না।

সেইখানেই মেঝের ওপর চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম, সর্বাঙ্গ বয়ে ঝরঝর করে ঘাম ঝরে সমস্ত মাটিটা ভিজে গেল।

শুধু একটা সান্ত্বনা ছিল, আজ তিনি আসবেন না, আজকার রাত্রিটা

অন্ততঃ চুপ করে পড়ে থাকতে পাব, তাঁর কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না।

কতবার ভাবলুম উঠে বসি, কাজকর্ম করি—যেন কিছুই হয়নি, কিন্তু কিছুতেই পারলুম না, সমস্ত শরীর যেন থরথর করতে লাগল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, এ ঘরে কেউ আলো দিতে এল না।

রাত্রি তখন প্রায় আটটা, সহসা তাঁর গলা বাইরে থেকে কানে আসতেই বুকের সমস্ত রক্ত-চলাচল যেন একেবারে থেমে গেল। তিনি চাকরকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, বন্ধু, নরেনবাবু হঠাৎ চলে গেলেন কেন রে। চাকরের জবাব শোনা গেল না। তখন নিজেই বললেন, খুব সম্ভব শিকার করতে বারণ করেছিলুম বলে। তা উপায় কি!

অন্দরে ঢুকতেই, শাশুড়ী ঠাকরুন ডেকে বললেন, একবার আমার ঘরে এস ত বাবা!

তাঁর যে একমুহূর্ত দেরি সইবে না, সে আমি জানতুম। তিনি যখন আমায় ঘরে এলেন, আমি কিসের একটা প্রচণ্ড নিষ্ঠুর আঘাত প্রতীক্ষা করেই যেন সর্বাঙ্গ কাঠের মত শক্ত করে পড়ে রইলুম, কিন্তু তিনি একটা কথাও বললেন না। কাপড়চোপড় ছেড়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে বেরিয়ে গেলেন, যেন কিছুই হয়নি, শাশুড়ী তাঁকে যেন এইমাত্র একটা কথাও বলেন নি। তার পরে যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তিনি ঘরে শুতে এলেন।

সারারাত্রির মধ্যে আমার সঙ্গে একটা কথাও হ'ল না। সকালবেলা সমস্ত দ্বিধাসঙ্কোচ প্রাণপণে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, মেজজা বললেন, হেঁসেলে তোমার আর এসে কাজ নেই দিদি, আজ আমিই আছি।

কাজ কি, মা কি জন্যে বারণ করে গেলেন, বলে তিনি যে ঘাড় ফিরিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন, সে আমি স্পষ্ট টের পেলুম। মুখ দিয়ে আমার একটা কথাও বার হ'ল না, আড়ষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে ফিরে এলুম।

দেখলুম, বাড়িসুদ্ধ সকলের মুখ ঘোর অন্ধকার, শুধু যাঁর মুখ সবচেয়ে অন্ধকার হবার কথা, তাঁর মুখেই কোন বিকার নেই। স্বামীর নিত্য-প্রসন্ন মুখ, আজও তেমনি প্রসন্ন।

হায় রে, শুধু একবার গিয়ে যদি বলি, প্রভু এই পাপিষ্ঠার মুখ থেকে তার অপরাধের বিবরণ শুনে তাকে নিজের হাতে দণ্ড দাও, কিন্তু সমস্ত লোকের এই বিচারহীন শাস্তি আর সহ্য হয় না! কিন্তু সে ত কোনমতেই পারলুম না।

তবুও এই বাড়িতে এই ঘরের মধ্যেই আমার দিন কাটতে লাগল।

এ কেমন করে আমার দ্বারা সম্ভব হতে পেরেছিল, তা আজ আমি জানি। যে কাল মায়ের বুক থেকে পুত্রশোকের ভার পর্যন্ত হালকা করে দেয়, সে যে এই পাপিষ্ঠার মাথা থেকে তার অপরাধের বোঝা লঘু করে দেবে, সে আর বিচিত্র কি! যে দণ্ড একদিন মানুষ অকাতরে মাথায় তুলে নেয়, আর একদিন তাকেই সে মাথা থেকে ফেলতে পারলে বাঁচে! কালের ব্যবধানে অপরাধের খোঁচা যতই অস্পষ্ট, যত লঘু হয়ে আসতে থাকে, দণ্ডের ভার ততই গুরুতর, ততই অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। এই ত মানুষের মন! এই ত তার গঠন। তাকে অনিশ্চিত সংশয়ে মরিয়া করে তোলে। একদিন দুদিন করে যখন সাতদিন কেটে গেল, তখন কেবলই মনে হতে লাগল, এতই কি দোষ করেছি যে স্বামী একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা না করে নির্বিচারে দণ্ড দিয়ে যাবেন! কিন্তু তিনি যে সকলের সঙ্গে মিলে নিঃশব্দে আমাকে পীড়ন করে যাচ্চেন, এ বুদ্ধি যে কোথায় পেয়েছিলুম, এখন তাই শুধু ভাবি।

সেদিন সকালে শুনলুম, শাশুড়ী বলচেন, ফিরে এলি মা মুক্ত! পাঁচদিন বলে কতদিন দেরি করলি বল ত বাছা?

সে যে কেন ফিরে এসেচে, তা মনে মনে বুঝলুম।

নাইতে যাচ্ছি, দেখা হ'ল। মুচকি হেসে হাতের মধ্যে একটা কাগজ গুঁজে দিলে। হঠাৎ মনে হ'ল, সে যেন একটুকরো জ্বলন্ত কয়লা আমার হাতের তেলোয় টিপে ধরেচে। ইচ্ছে হ'ল তখখুনি কুটিকুটি করে ছিড়ে ফেলে দিই। কিন্তু সে যে নরেনের চিঠি! না পড়েই যদি ছিড়ে ফেলতে পারব, তা হলে মেয়েমানুষের মনের মধ্যে বিশ্বের সেই অফুরন্ত চিরন্তন কৌতূহল জমা রয়েচে কিসের জন্যে? নির্জন পুকুরঘাটে জলে পা ছড়িয়ে দিয়ে চিঠি খুলে বসলুম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা কথাও পড়তে পারলুম না। চিঠি লাল কালিতে লেখা, মনে হতে লাগল তার রাঙ্গা অক্ষরগুলো যেন একপাল কেন্নোর বাচ্চার মত গায়ে গায়ে জড়িয়ে কিলবিল করে নড়ে নড়ে বেড়াচ্চে। তার পরে পড়লুম—একবার দু'বার, তিনবার পড়লুম। তার পরে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ে স্নান করে ঘরে ফিরে এলুম। কি ছিল তাতে? সংসারে যা সবচেয়ে বড় অপরাধ, তাই লেখা ছিল।

ধোপা এসে বললে, মাঠাকরুন, বাবুর ময়লা কাপড় দাও।

জামার পকেটগুলো সব দেখে দিতে গিয়ে একখানা পোস্টকার্ড বেরিয়ে

এল, হাতে তুলে দেখি, আমার চিঠি, মা লিখেচেন। তারিখ দেখলুম, পাঁচদিন আগের, কিন্তু আজও আমি পাইনি।

পড়ে দেখি সর্বনাশ। মা লিখেচেন, শুধু রান্নাঘরটি ছাড়া আর সমস্ত পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। এই ঘরটির মধ্যে কোন মতে সবাই মাথা গুঁজে আছেন।

দু'চোখ জ্বালা করতে লাগল কিন্তু একফোঁটা জল বেরুল না। কতক্ষণ যে এভাবে বসেছিলুম জানিনে, ধোপার চীৎকারে আবার সজাগ হয়ে উঠলুম। তাড়াতাড়ি তাকে কাপড়গুলো ফেলে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লুম। এইবার চোখের জলে বালিশ ভিজে গেল। কিন্তু এই কি তাঁর ঈশ্বরপরায়ণতা! আমার মা গরীব, একবিন্দু সাহায্য করতে অনুরোধ করি, এই ভয়ে চিঠিখানা পর্যন্ত আমাকে দেওয়া হয়নি। এতবড় ক্ষুদ্রতা আমার নাস্তিক মামার দ্বারা কি কখনো সম্ভব হতে পারত!

আজ তিনি ঘরে আসতে কথা কইলুম। বললুম, আমাদের বাড়ি পুড়ে গেছে।

তিনি মুখপানে চেয়ে বললেন, কোথায় শুনলে?

গায়ের ওপর পোস্টকার্ড ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জবাব দিলুম, ধোপাকে কাপড় দিয়ে তোমারই পকেট থেকে পেলুম। দেখ, আমাকে নাস্তিক বলে তুমি ঘৃণা কর জানি, কিন্তু যারা লুকিয়ে পরের চিঠি পড়ে, আড়ালে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়ায়, তাদের আমরাও ঘৃণা করি। তোমার বাড়িসুদ্ধ লোকেরই কি এই ব্যবসা!

যে লোক নিজের অপরাধে মগ্ন হয়ে আছে, তার মুখের এই কথা! কিন্তু আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি, এতবড় স্পর্ধিত আঘাত আমার স্বামী ছাড়া আর কেউ সহ্য করতে পারত না। মহাপ্রভুর শাসন কি অক্ষয় কবচের মতই যে তাঁর মনটিকে অহর্নিশ ঘিরে রক্ষে করত, আমার এমন তীক্ষ্ণ শূলও খানখান হয়ে পড়ে গেল।

একটুখানি ম্লান হেসে বললেন, কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম সদু, আমাকে মাফ কর।

এই প্রথম তিনি আমাকে নাম ধরে ডাকলেন।

বললুম, মিথ্যে কথা। তা হলে আমার চিঠি আমাকে দিতে। কেন এ খবর লুকিয়েচ, তাও জানি।

তিনি বললেন, শুধু দুঃখ পেতে বৈ ত না! তাই ভেবেছিলুম, কিছু দিন পরে তোমাকে জানাব।

বললুম, কেমন করে তুমি হাত গোণো, সে আমার জানতে বাকী নেই! তুমিই কি বাড়িসুদ্ধ সবাইকে আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছ? স্পাই! ইংরেজ-মহিলারা এমন স্বামীর মুখ পর্যন্ত দেখে না, তা জানো?

ওরে হতভাগী? বল, বল, যা মুখে আসে বলে নে। শাস্তি তোর গেছে কোথায়, সবই তোলা রইল!

স্বামী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, একটা কথারও জবাব দিলেন না। এখন ভাবি, এত ক্ষমা করতেও মানুষে পারে।

কিন্তু আমার ভেতরে যত গ্লানি, যত অপমান এতদিন ধীরে ধীরে জমা হয়ে উঠেছিল, একবার মুক্তি পেয়ে তারা কোনমতেই ফিরতে চাইলে না।

একটু থেমে আবার বললুম, আমি হেঁসেলে ঢুকতে—

তিনি একটুখানি যেন চমকে উঠে মাঝখানেই বলে উঠলেন, উঃ, তাই বটে! তাই আমার খাবার ব্যবস্থাটা আবার—

বললুম, সে নালিশ আমার নয়। বাঙালীর ঘরে জন্মেচি বলেই যে তোমরা খুঁচে খুঁচে আমাকে তিল তিল করে মারবে, সে অধিকার তোমাদের আমি কিছুতেই দেব না, তা নিশ্চয় জেনো। আমার মামার বাড়িতে এখনো রান্নাঘরটা বাকী আছে, আমি তার মধ্যেই আবার ফিরে যাব। কাল আমি যাচ্ছি।

স্বামী অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললেন, যাওয়াই উচিত বটে। কিন্তু তোমার গয়নাগুলো রেখে যেয়ো!

শুনে অবাক হয়ে গেলুম। এত হীন, এত ছোট স্বামীর স্ত্রী আমি! পোড়া মুখে হঠাৎ হাসি এল। বললুম, সেগুলো কেড়ে নিতে চাও ত? বেশ, আমি রেখেই যাব।

প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তাঁর মুখখানি যেন সাদা হয়ে গেল। বললেন, না না, তোমার কিছু গয়না আমি ভিক্ষে চাচ্ছি, আমার টাকার বড় অনটন, তাই বাঁধা দেব।

কিন্তু এমন পোড়াকপালী আমি যে, ও-মুখ দেখেও কথাটা বিশ্বাস করতে পারলুম না। বললুম, বাঁধা দাও, বেচে ফেল, যা ইচ্ছে কর, তোমাদের গয়নার ওপর আমার এতটুকু লোভ নেই। বলে, তখুনি বাক্স খুলে আমার সমস্ত গয়না

বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। যে দু' গাছি বালা মা দিয়েছিলেন, সেই দুটি ছাড়া গা থেকে পর্যন্ত গয়না খুলে ফেলে দিলুম। তাতেও তৃপ্তি হ'ল না, বেনারসী কাপড় জামা প্রভৃতি যা কিছু এঁরা দিয়েছিলেন, সমস্ত বার করে টান মেরে ফেলে দিলুম।

স্বামী পাথরের মত স্থির নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। আমার ঘৃণার বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা বিষিয়ে উঠল যে, এক ঘরের মধ্যে থাকাও অসহ্য হয়ে পড়ল। বেরিয়ে এসে অন্ধকার বারান্দায় একধারে আঁচল পেতে শুয়ে পড়লুম। মনে হ'ল, দোরের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে গেল।

কান্নায় বুক ফেটে যেতে লাগল, তবু প্রাণপণে মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে মান বাঁচালুম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানিনে, উঠে দেখি, ভোর হয়-হয়। ঘরে গিয়ে দেখি, বিছানা খালি, দু'-একখানা ছাডা প্রায সমস্ত গয়না নিয়ে তিনি কখন বেরিয়ে গেছেন।

সারাদিন তিনি বাড়ি এলেন না। রাত্রি বারোটা বেজে গেল, তাঁর দেখা নাই।

তন্দ্রার মধ্যেও বোধ করি সজাগ ছিলুম। রাত্রি দুটোর পর বাগানের দিকেই সেই জানলাটার গায়ে খটখট শব্দ শুনেই বুঝলুম, এ নরেন। কেমন করে যেন আমি নিশ্চয় জানতুম, আজ রাত্রে সে আসবে। স্বামী ঘরে নেই, এ খবর মুক্ত দেবেই এবং এ সুযোগ সে কিছুতে ছাড়বে না। কোথাও কাছাকাছি সে যে আছেই, এ যেন আমি ভাবী অমঙ্গলের মত অনুভব করতুম। নরেন এত নিঃসংশয় ছিল যে, সে অনায়াসে বললে, দেরি ক'র না, যেমন আছ বেরিয়ে এসো, মুক্ত খিড়কি খুলে দাঁড়িয়ে আছে।

বাগান পার হয়ে রাস্তা দিয়ে অনেকখানি অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলুম। মা বসুমতি! গাড়িসুদ্ধ হতভাগীকে সেদিন গ্রাস করলে না কেন?

কলকাতায় বৌবাজারের একটা ছোট্ট বাসায় গিয়ে যখন উঠলুম, তখন বেলা আটটা। আমাকে পৌঁছে দিয়েই নরেন তার নিজের বাসায় কিছুক্ষণের জন্য চলে গেল। দাসী উপরের ঘরে বিছানা পেতে রেখেছিল, টলতে টলতে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। আশ্চর্য যে, যে কথা কখনও ভাবিনি, সমস্ত ভাবনা ছেয়ে তখন সেই কথাই আমার মনে পড়তে লাগল। আমি ন'বছর বয়সে একবার জলে

ডুবে যাই, অনেক যত্ন-চেষ্টার পরে জ্ঞান হলে মায়ের হাত ধরে ঘরের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। মা শিয়রে বসে এক হাতে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে এক হাতে পাখার বাতাস করেছিলেন—মায়ের মুখ, আর তাঁর সেই পাখা নিয়ে হাতনাড়াটা ছাড়া সংসারে আর যেন আমার কিছু রইল না।

দাসী এসে বললে, বৌমা, কলের জল চলে যাবে, উঠে চান করে নাও।

স্নান করে এলুম, উড়ে-বামুন ভাত দিয়ে গেল। মনে হয় কিছু খেয়েও ছিলুম, কিন্তু উঠতে না উঠতে সমস্ত বমি হয়ে গেল। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে নির্জীবের মত বিছানায় এসে শুয়ে পড়ামাত্রই বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

স্বপ্ন দেখলুম, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করচি। তিনি তেমনি নীরবে বসে আছেন, আর আমি গায়ের গয়না খুলে তাঁর কাছে ছুঁড়ে ফেলচি; কিন্তু গয়নাগুলোও আর ফুরোয় না, আমার ছুঁড়ে ফেলাও থামে না। যত ফেলি ততই যেন কোথা থেকে গয়নায় সর্বাঙ্গ ভরে ওঠে।

হঠাৎ হাতের ভারী অনন্তটা ছুঁড়ে ফেলতেই সেইটা সজোরে গিয়ে তাঁর কপালে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন, আর সেই ফাটা কপাল থেকে রক্তের ধারা ফিনকি দিয়ে কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকতে লাগল।

এমন করে কতক্ষণ যে কেটেছিল, আর কতক্ষণ যে কাটতে পারত, বলতে পারিনে। যখন ঘুম ভাঙল, তখন চোখের জলে বালিশ-বিছানা ভিজে গেছে।

চোখ চেয়ে দেখি, তখন অনেক বেলা আছে, আর নরেশ পাশে বসে আমাকে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙ্গাচ্চে। সে বললে, স্বপন দেখছিলে? ইস্ এ হয়েচে কি! বলে কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলে।

স্বপন! একমুহূর্তে মনটা যেন স্বস্তিতে ভরে গেল।

চোখ রগড়ে উঠে বসে দেখলুম, সুমুখেই মস্ত একটা কাগজেমোড়া পার্শেল।

ও কি?

তোমার জামা-কাপড় সব কিনে আনলুম।

তুমি কিনতে গেলে কেন?

নরেন একটু হেসে বললে, আমি ছাড়া আর কে কিনবে?

এত কান্না আমি আর কখনও কাঁদিনি। নরেন বললে, আচ্ছা, পা ছেড়ে উঠে ব'স বোন, আমি দিব্যি করচি, আমরা এক মায়ের পেটের ভাইবোন। তোকে যত ভালই বাসিনে কেন, তবু আমি আমার কাছ থেকে তোকে চিরকাল রক্ষে করব।

চিরকাল! না না, তাঁর পায়ের ওপর আমাকে তোমরা ফেলে দিয়ে চলে এস নরেনদাদা। আমার অদৃষ্টে যা হবার তা হোক! কাল সমস্ত রাত্রি তাঁকে চোখে দেখিনি, আজ আবার সমস্ত রাত্রি দেখতে না পেলে যে আমি মরে যাব ভাই।

দাসী ঘরে প্রদীপ দিয়ে গেল। নরেন উঠে গিয়ে একটা মোড়ার ওপরে বসে বললে, মুক্তর কাছে আমি সমস্ত শুনেচি! কিন্তু তাঁকে যদি এতই ভালবাসতে, কোনদিন একসঙ্গে ত—

তাড়াতাড়ি বললুম, তুমি আমার বড়ভাই, এ-সব কথা আমাকে তুমি জিজ্ঞেস ক'র না।

নরেন অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললে, আমি আজই তোমাকে তোমাদের বাগানের কাছে রেখে আসতে পারি, কিন্তু তিনি কি তোমাকে নেবেন? তখন গ্রামের মধ্যে তোমার কি দুর্গতি হবে বল ত?

বুকের ভেতরটা কে যেন দু'হাতে পাকিয়ে মুচড়ে দিলে। কিন্তু তখ্‌খুনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, ঘরে নেবেন না সে জানি, কিন্তু তিনি যে আমাকে মাপ করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যত বড় অপরাধ হোক, সত্যি সত্যি মাপ চাইলে তাঁর না বলবার জো নেই, এ যে আমি তাঁর মুখেই শুনেচি ভাই। আমাকে তুমি তাঁর পায়ের তলায় রেখে এস নরেনদাদা, ভগবান তোমাকে রাজ্যেশ্বর করবেন, আমি কায়মনে বলচি।

মনে করেছিলুম, আর চোখের জল ফেলব না, কিন্তু কিছুতেই ধরে রাখতে পারলুম না, আবার ঝরঝর করে পড়তে লাগল। নরেন মিনিট-খানেক চুপ করে থেকে বললে, সদু, তুমি কি সত্যিই ভগবান মানো?

আজ চরম দুঃখে মুখ দিয়ে পরম সত্য বার হয়ে গেল, বললুম, মানি। তিনি আছেন বলেই ত এত করেও ফিরে যেতে চাইচি। নইলে এইখানে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম নরেনদাদা, ফিরে যাবার কথা মুখে আনতুম না।

নরেন বললে, কিন্তু আমি ত মানিনে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, আমি বলচি, আমার মত তুমিও একদিন নিশ্চয় মানবে।

সে তখন বোঝা যাবে। বলে নরেন গম্ভীর-মুখে বসে রইল। মনে মনে কি যেন ভাবছে বুঝতে পেরে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলুম। আমার এক মিনিট দেরি সইছিল না, বললুম, আমাকে কখন রেখে আসবে নরেনদাদা?

নরেন মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, সে কখ্খনো তোমাকে নেবে না।

সে চিন্তা কেন করচ ভাই? নিন, না-নিন সে তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু আমাকে তিনি ক্ষমা করবেন, এ কথা নিশ্চয় বলতে পারি।

ক্ষমা! না নিলে ক্ষমা করা, না-করা দুই-ই সমান। তখন তুমি কোথায় যাবে বল ত? সমস্ত পাড়ার মধ্যে কতবড় একটা বিশ্রী হৈচৈ গণ্ডগোল পড়ে যাবে, একবার ভেবে দেখ দিকি।

ভয়ে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললুম, সে ভাবনা এতটুকু ক'রো না নরেনদাদা! তখন তিনি আমার উপায় করে দেবেন।

নরেন আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, আর তোমারই না হয় একটা উপায় করবেন, কিন্তু আমার ত করবেন না! তখন?

এ কথার কি জবাব দেব ভেবে পেলুম না। বললুম, তাতেই বা তোমার ভয় কি?

নরেন-ম্লানমুখে জোর করে একটু হেসে বললে, ভয়? এমন কিছু নয়, পাঁচ-সাত বছরের জন্যে জেল খাটতে হবে। শেষকালে এমন করে তুমি আমাকে ডোবাবে জানলে আমি এতে হাতই দিতুম না। মনের এতটুকু স্থিরতা নেই, এ কি ছেলেখেলা?

আমি কেঁদে ফেলে বললুম, তবে আমার কি উপায় হবে ভাই? আমার সমস্ত অপরাধ তাঁর পায়ে নিবেদন না করে ত আমি কিছুতে বাঁচব না!

নরেন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, শুধু নিজের কথাই ভাবচ, আমার বিপদ ত ভাবচ না? এখন সবদিক না বুঝে আমি কোন কাজ করতে পারব না।

ও কি, বাসায় যাচ্চ নাকি?

হুঁ।

রাগে, দুঃখে, হতাশ্বাসে আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মাথা কুটে কাঁদতে লাগলুম—তুমি সঙ্গে না যাও, এইখান থেকে আমার যাবার উপায় করে দাও, আমি একলা ফিরে যাব! ওগো, আমি তাঁর দিব্যি করে বলচি আমি কারুর নাম করব না, কাউকে বিপদে জড়াব না, সমস্ত শাস্তি একা মাথা পেতে নেব। তোমার দুটি পায়ে পড়ি নরেনদা, আমাকে আটকে রেখে আমার সর্বনাশ ক'র না।

মুখ তুলে দেখি, সে ঘরে নেই, পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেছে। ছুটে গিয়ে সদর দরজায় দেখি, তালা বন্ধ। উড়ে-বামুন বললে, বাবু চাবি নিয়ে চলে

গেছেন, কাল সকালে এসে খুলে দেবেন।

ঘরে ফিরে এসে আর-একবার মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললুম, ভগবান! কখনো তোমাকে ডাকিনি, আজ ডাকচি, তোমার এই একান্ত নিরুপায় মহাপাপিষ্ঠা সন্তানের গতি দাও।

আমার সে ডাক কত প্রচণ্ড, তার শক্তি যে কত দুর্নিবার, আজ সে শুধু আমিই জানি।

তবু সাতদিন কেটে গেল। কিন্তু কেমন করে যে কাটল, সে ইতিহাস বলবার আমার সামর্থ্যও নেই, ধৈর্যও নেই। সে যাক।

বিকেলবেলায় আমার ওপরের ঘরের জানালায় বসে নীচে গলির পানে তাকিয়ে ছিলুম। আপিসের ছুটি হয়ে গেছে, সারাদিনের খাটুনির পর বাবুরা বাড়িমুখো হনহন করে চলেছে। অধিকাংশই সামান্য গৃহস্থ। তাদের বাড়ির ছবি আমার চোখের ওপর স্পষ্ট ফুটে উঠল। বাড়ির মেয়েদের মধ্যে এখন সবচেয়ে কারা বেশী ব্যস্ত, জলখাবার সাজাতে, চা তৈরি করতে সবচেয়ে কারা বেশী ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চে, সেটা মনে হতেই বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। মনে পড়ল, তিনিও সমস্তদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বাড়ি ফিরে এলেন। কোথায় কাপড়, কোথায় গামছা, কোথায় জল! ডাকাডাকির পর কেউ হয়ত সাড়াও দিলে না। তার পরে, হয়ত মেজদেওরের খাবারের সঙ্গে তাঁরও একটুখানি জলখাবারের যোগাড় মেজবৌ করে রেখেচে, না হয় ভুলেই গেছে! আমি ত আর নেই, ভুলতে ভয়ই বা কি! হয়ত বা শুধু এক গেলাস জল চেয়ে খেয়ে ময়লা বিছানাটা কোঁচা দিয়ে একটু ঝেড়ে নিয়ে শুয়ে পড়বেন! তার পরে, রাতদুপুরে দুটো শুকনো ঝরঝরে ভাত, একটু ভাতেপোড়া। ও-বেলার একটুখানি ডাল হয়ত বা আছে, হয়ত বা উঠে গেছে। সকলের দিয়ে-থুয়ে দুধ একটু বাঁচে ত পরম ভাগ্য। নিরীহ ভালমানুষ, কাউকে কড়া কথা বলতে পারেন না, কারো ওপর রাগ দেখাতে জানেন না—

ওরে মহাপাতকি! এতবড় নিষ্ঠুর মহাপাপ তোর চেয়ে বেশী সংসারে কেউ কি কোনদিন করেছে? ইচ্ছে হ'ল এই লোহার গরাদেতে মাথাটা ছেঁচে ফেলে সমস্ত ভাবনাচিন্তার এইখানেই শেষ করে দিই!

বোধ করি অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনদিকেই চোখ ছিল না, হঠাৎ কড়ানাড়ার শব্দে চমকে উঠে দেখি, সদর দরজায় দাঁড়িয়ে নরেন আর মুক্ত। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে নীচের বিছানায় উঠে এসে বসলুম; সেইদিন থেকে নরেন

আর আসেনি। আমার সমস্ত মন যে কোথায় পড়ে আছে সে নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিল বলে ভয়ে এদিক মাড়াত না। তার নিজের ধারণা জন্মেছিল, বিপদে পড়লে স্বামীর বিরুদ্ধে আমি তার উপকারেই লাগব না। তাই তার ভয়ও যেমন হয়েছিল, রাগও তেমনি হয়েছিল। ঘরে ঢুকে আমার দিকে চেয়েই দু'জনে একসঙ্গে চমকে উঠল, নরেন বললে, তোমার এত অসুখ করেছিল ত আমাকে খবর দাওনি কেন? তোমার বামুনটা ত আমার বাসা চেনে?

ঝি দালানে ঝাঁট দিচ্ছিল, সে খপ করে বলে বসল, অসুখ করবে কেন? শুধু জল খেয়ে থাকলে মানুষ রোগা হবে না বাবু? দুটি বেলা দেখচি ভাতের থালা যেমন বাড়া হয়, তেমনি পড়ে থাকে। অর্ধেক দিন ত হাতও দেন না।

শুনে দু'জনেই স্তব্ধ হয়ে আমার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্ধ্যার পর নরেন বাসায় চলে গেলে, মুক্তকে নীচে টেনে নিয়ে বললুম, কেমন আছেন তিনি।

মুক্ত কেঁদে ফেললে। বললে, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই বৌমা, নইলে এমন সোয়ামীর ঘর করতে পেলে না!

তুই ত করতে দিলি না মুক্ত!

মুক্ত চোখ মুছে বললে, মনে হলে বুকের ভিতরটায় যে কি করতে থাকে, সে আর তোমাকে কি বলব? বাবু ছাড়া আর সবাই জানে, তুমি বাড়ি-পোড়ার খবর পেয়ে রাত্তিরেই রাগারাগি করে বাপের বাড়ি চলে গেছ। তোমার শাশুড়ীও তাঁর হুকুম নেওয়া হয়নি বলে রাগ করে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাই বন্ধ করে দিয়েচে। মাগী কি বজ্জাত মা, কি বজ্জাত! যে কষ্টটা বাবুকে দিচ্ছে, দেখলে পাষাণের দুঃখ হয়। সাধে কি আর তুমি ঝগড়া করতে বৌমা!

ঝগড়া করা আমার চিরকালের জন্য ঘুচে গেল! বলতে গিয়ে সত্যি সত্যি যেন দম আটকে এল।

আজ মুক্তর কাছে শুনতে পেলুম, আমাদের পোড়া-বাড়ি আবার মেরামত হচ্ছে, তিনি টাকা দিয়েছেন। হয়ত সেইজন্যই আমার গয়নাগুলো হঠাৎ বাঁধা দেবার তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল।

বললুম, বল্ মুক্ত, সব বল্। যত-রকমের বুকফাটা খবর আছে সমস্ত আমাকে একটি একটি করে শোনা, এতটুকু দয়া তোরা আমাকে করিস নে।

মুক্ত বললে, এ বাড়ির ঠিকানা তিনি জানেন।

শিউরে উঠে বললুম, কি করে?

মাস-খানেক আগে যখন এ বাড়ি তোমার জন্যেই ভাড়া নেওয়া হয় তখন আমি জানতুম।

তার পর?

একদিন নদীর ধারে নরেনবাবুর সঙ্গে আমাকে লুকিয়ে কথা কইতে তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন।

তার পর?

বামুনের পা ছুঁয়ে মিথ্যে বলতে পারলুম না বৌমা—চলে আসবার দিন এ বাসার ঠিকানা বলে ফেললুম।

এলিয়ে মুক্তর কোলের ওপরেই চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম।

অনেকক্ষণ পরে মুক্ত বললে, বৌমা!

কেন মুক্ত?

যদি তিনি নিজে তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসে পড়েন?

প্রাণপণ বলে উঠে বসে মুক্তর মুখ চেপে ধরলুম—না মুক্ত, ও কথা তোকে আমি বলতে দেব না। আমার দুঃখ আমাকে সজ্ঞানে বইতে দে, পাগল করে দিয়ে আমার প্রায়শ্চিত্তের পথ তুই বন্ধ করে দিসনে।

মুক্ত জোর করে তার মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, আমাকেও ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বৌমা! টাকার সঙ্গে ত ওকে ওজন করে ঘরে তুলতে পারব না।

এ কথার আর জবাব দিলুম না, চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম। মনে মনে বললুম, ওরে মুক্ত, পৃথিবী এখনও পৃথিবী আছে। আকাশকুসুমের কথা কানেই শোনা যায়, তাকে ফুটতে কেউ আজও চোখে দেখেনি।

ঘণ্টা-খানেক পরে মুক্ত নীচে থেকে ভাত খেয়ে ফিরে এল, তখন রাত্রি দশটা। ঘরে ঢুকেই বললে, মাথার আঁচলটা তুলে দাও বৌমা, বাবু আসছেন, বলেই বেরিয়ে গেল।

আবার এত রাত্রে? তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে উঠে বসতেই দেখলুম দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নরেন নয়, আমার স্বামী।

বললেন, তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। আমি জানি, তুমি আমারই আছ। বাড়ি চল।

মনে মনে বললুম, ভগবান! এত যদি দিলে, তবে আরও একটু দাও, ওই দুটি পায়ে মাথা রাখবার সময়টুকু পর্যন্ত আমাকে সচেতন রাখো।

মন্দির

এক

এক গ্রামে নদীর তীরে দু'ঘর কুমোর বাস করিত। তাহারা নদীর মাটি তুলিয়া ছাঁচে ফেলিয়া পুতুল তৈরি করিত, আর হাটে বিক্রয় করিয়া আসিত। চিরকাল তাহারা এই কাজ করে, চিরকাল এই মাটির পুতুল তাহাদিগের পরনের বস্ত্র ও উদরের অন্ন যোগাইয়া থাকে। মেয়েরা কাজ করে, জল তুলে, রাঁধিয়া স্বামী পুত্রকে খাওয়ায় এবং নিবান ভস্মস্তূপের ভিতর হইতে পোড়া পুতুল বাহির করিয়া আঁচল দিয়া ঝাড়িয়া চিত্রিত হইবার জন্য পুরুষদের হাতের কাছে আগাইয়া দেয়।

শক্তিনাথ এই কুম্ভকার-পরিবারের মধ্যে আসিয়া স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। রোগক্লিষ্ট ক্ষীণদেহ এই ব্রাহ্মণকুমার, তাহার বন্ধুবান্ধব, খেলাধূলা, লেখাপড়া সব ছাড়িয়া দিয়া মাটির পুতুলের পানে অকস্মাৎ একদিন ঝুঁকিয়া পড়িল। সে বাঁশের ছুরি ধুইয়া দিত, ছাচের ভিতর হইতে পরিষ্কার করিয়া মাটি চাঁচিয়া ফেলিত এবং উৎকণ্ঠিত ও অসন্তুষ্টচিত্তে পুতুলের চিত্রাঙ্কন-কার্য কেমন অসাবধানতার সহিত সমাধা হইতেছে, তাহাই দেখিত। কালি দিয়া পুতুলের ভ্রূ চক্ষু, ওষ্ঠ প্রভৃতি লিখিত হইত। কোনটার ভ্রূ মোটা, কোনটার আধখানা, কাহারো বা ওষ্ঠের নীচে কালির আঁচড় লাগিয়া থাকিত। শক্তিনাথ অধীর ঔৎসুক্যে আবেদন করিত, সরকারদাদা, অমন তাচ্ছিল্য করে আঁকচ কেন? সরকারদাদা অর্থাৎ কারিকর সস্নেহে হাসিয়া জবাব দিত, বামনঠাকুর, ভাল করে আঁকতে গেলে বেশী দাম লাগে, অত কে দেবে বল? এক পয়সারপুতুল ত আর চার পয়সায় বিকোবে না।

দুই

এ সহজ কথাটার অনেক আলোচনা করিয়াও শক্তিনাথ আধখানা মাত্র বুঝিয়াছিল। এক পয়সার পুতুল ঠিক পয়সায় বিকাইবে, তাহার ভ্রূ থাকুক, আধখানা ভ্রূ নাই থাকুক। দুই চক্ষু সমান অসমান যাই হউক, সেই এক

পয়সা। মিছামিছি কে এত পরিশ্রম করিবে? পুতুল কিনিবে বালক, দু'দণ্ড তাহাকে আদর করিবে, শোয়াইবে, বসাইবে, কোলে করিবে—তার পর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিবে—এই ত?

শক্তিনাথ বাটী হইতে সকালবেলা যে মুড়িমুড়কি কাপড়ে বাঁধিয়া আনিয়াছিল, তাহার ভুক্তাবশিষ্ট এখনো বাঁধা আছে, তাহাই খুলিয়া অতিশয় অন্যমনস্কভাবে চিবাইতে চিবাইতে ছড়াইতে ছড়াইতে সে তাহাদের জীর্ণ বাটীর প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। বাটীতে কেহ নাই। ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধ পিতা জমিদারবাটীতে মদনমোহন ঠাকুরের পূজা করিতে গিয়াছেন। ভিজা আলো-চাল, কলা, মূলা প্রভৃতি উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্য বাঁধিয়া আনিবেন, তাহার পর পাক দিয়া পুত্রকে খাওয়াইবেন, নিজেও খাইবেন। বাড়ির উঠান কুঁদফুল করবীফুল ও শেফালীফুল গাছে পূর্ণ। গৃহলক্ষ্মীহীন বাটীটার সর্বত্রই জঙ্গল; কিছুতে শৃঙ্খলা নাই, কাহারো পারিপাট্য নাই। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য মধুসূদন কোনরূপে দিনপাত করেন। শক্তিনাথ ফল পাড়িয়া, ডাল নাড়িয়া পাতা ছিঁড়িয়া উঠানময় অন্যমনস্কভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

প্রতিদিন সকালবেলা শক্তিনাথ কুমোর-বাড়ি যায়। আজকাল সে পুতুলে রং দিবার অধিকার পাইয়াছে। তাহার সরকারদাদা সযত্নে সবচেয়ে ভাল পুতুলটা তাহাকে বাছিয়া দিয়া বলে, নাও দাদাঠাকুর, তুমি চিত্তির কর। দাদাঠাকুর একবেলা ধরিয়া একটি পুতুল চিত্রিত করে। হয়ত খুব ভালই হয়, তবু এক পয়সার বেশী দাম উঠে না। সরকারদাদা কিন্তু বাটী আসিয়া বলে, বামুনঠাকুরের চিত্রি-করা পুতুলটি দু'পয়সায় বিকিয়েচে। শুনিয়া শক্তিনাথের আর আনন্দ ধরে না।

তিন

এ গ্রামের জমিদার কায়স্থ। দেবদ্বিজে তাঁহার বাড়াবাড়ি ভক্তি। গৃহদেবতা নিকষনির্মিত মদনমোহন-বিগ্রহ; পার্শ্বে স্বর্ণরঞ্জিত শ্রীরাধা—অত্যুচ্চ মন্দিরে রৌপ্য-সিংহাসনে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। বৃন্দাবনলীলার কত অপরূপ চিত্র মন্দির গাত্রে সংলগ্ন। উপরে কিংখাপের চন্দ্রাতপ, তাহাতে শতশাখার ঝাড় ঝুলিতেছে। এক পার্শ্বে মর্মর-বেদীর উপর উপকরণ সজ্জিত এবং নিত্যনিবেদিত পুষ্প-চন্দনের ঘনসৌরভে মন্দিরাভ্যন্তর সমাচ্ছন্ন। বুঝি, স্বর্গসুখ ও সৌন্দর্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে এই পুষ্প ও গন্ধ পূজার প্রথম উপাচার হইয়া আছে

এবং তাহারই সুকোমল সুরভি বায়ুর স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইয়া মন্দিরবায়ুকে নিবিড় করিয়া রাখিয়াছে।

চার

অনেকদিনের কথা বলিতেছি। জমিদার রাজনারায়ণবাবু যখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়া প্রথম বুঝিলেন, যে, এ জীবনের ছায়া ক্রমশঃ দীর্ঘ ও অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে, যেদিন সর্বপ্রথম বুঝিলেন যে, এ, জমিদারি ও ধন-ঐশ্বর্য ভোগের মিয়াদ প্রতিদিন কমিয়া আসিতেছে, প্রথম যেদিন মন্দিরের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চোখ দিয়া অনুতাপাশ্রু বিগলিত হইয়াছিল, আমি সেইদিনের কথা বলিতেছি। তখন তাঁহার একমাত্র কন্যা অপর্ণা—পাঁচ বছরের বালিকা। পিতার পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া একমনে সে দেখিত, মধুসূদন ভট্টাচার্য চন্দন দিয়া কালো পুতুলটি চর্চিত করিতেছেন, ফুল দিয়া সিংহাসন বেষ্টন করিতেছেন এবং তাহারই স্নিগ্ধ গন্ধ আশীর্বাদের মত যেন তাহাকে স্পর্শ করিয়া ফিরিতেছে। সেইদিন হইতে প্রতিদিনই এই বালিকা সন্ধ্যার পর পিতার সহিত ঠাকুরের আরতি দেখিতে আসিত এবং এই মঙ্গল-উৎসবের মধ্যে অকারণে বিভোর হইয়া চাহিয়া থাকিত।

ক্রমে অপর্ণা বড় হইতে লাগিল। হিন্দুর মেয়ে—ঈশ্বরের ধারণা যেমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করে, সেও তাহাই করিতে লাগিল এবং পিতার নিতান্ত আদরের সামগ্রী এই মন্দিরটি যে তাহারও বক্ষ-শোণিতের মত, এ কথা সে তাহার সমস্ত কর্ম ও খেলাধূলার মধ্যেও প্রমাণ করিতে বসিল। সমস্ত দিন এই মন্দিরের কাছাকাছি থাকিত এবং একটি শুষ্ক তৃণ বা একটি শুষ্ক ফলও সে মন্দিরের ভিতরে পড়িয়া থাকা সহ্য করিতে পারিত না। এক ফোঁটা জল পড়িলে সে সযতনে আঁচল দিয়া তাহা মুছিয়া লইত। রাজনারাণবাবুর দেবনিষ্ঠা—লোকে বাড়াবাড়ি মনে করিত, কিন্তু অপর্ণার দেবসেবাপরায়ণতা সে সীমাও অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল। সাবেক পুষ্পপাত্রে আর ফুল আঁটে না—একটা বড় আসিয়াছে। চন্দনের পুরাতন বাটিটা বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভোজ্য ও নৈবেদ্যর বরাদ্দ ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। এমন কি, নিত্য নূতন ও নানাবিধ পূজার আয়োজন ও তাহার নিখুঁত বন্দোবস্তের মাঝে পড়িয়া বৃদ্ধ পুরোহিত পর্যন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। জমিদার রাজনারায়ণ-বাবু এ-সব দেখিয়া শুনিয়া ভক্তি-স্নেহে গাঢ়স্বরে কহিতেন, ঠাকুর আমার ঘরে

তাঁহার নিজের সেবার জন্য লক্ষ্মীকে পাঠাইয়া দিয়াছেন—তোমরা কেহ কিছু বলিয়ো না।

পাঁচ

যথাসময়ে অপর্ণার বিবাহ হইয়া গেল। মন্দির ছাড়িয়া এইবার যে তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইবে, এই আশঙ্কায় তাহার মুখের হাসি অসময়ে শুকাইয়া গেল। দিন দেখান হইতেছে, তাহাকে শ্বশুরবাড়ি যাইতে হইবে। পরিপূর্ণ বিদ্যুৎ বুকে চাপিয়া বর্ষার ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ড যেমন অবরুদ্ধ গৌরবের গুরুভারে স্থির হইয়া কিছুক্ষণ আকাশের গায়ে বর্ষণোন্মুখভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, তেমনি স্থির হইয়া একদিন অপর্ণা শুনিল যে, সেই দেখান-দিন আজ আসিয়াছে। সে পিতার নিকট গিয়া কহিল, বাবা, আমি ঠাকুরসেবার যে বন্দোবস্ত করিয়া গেলাম, তাহার যেন অন্যথা না হয়। বৃদ্ধ পিতা কাঁদিয়া ফেলিলেন—তাই ত মা! না, অন্যথা কিছুই হবে না।

অপর্ণা নিঃশব্দে চলিয়া আসিল। তাহার মা নাই। সে কাঁদিতে পারিল না। বৃদ্ধ পিতার দুচোখ-ভরা জল, সে রোধ করিবে কি করিয়া? তাহার পর, যোদ্ধা যেমন করিয়া তাহার ব্যথিত ক্রন্দনোন্মুখ বীর-হৃদয় পৌরুষ-শুষ্ক হাসিতে চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি অশ্বে আরোহণপূর্বক চলিয়া যায়, তেমনি করিয়া অপর্ণা শিবিকারোহণে গ্রাম ত্যাগ করিয়া অজানা কর্তব্যের শাসন মাথা পাতিয়া লইয়া চলিয়া গেল। নিজের উচ্ছ্বসিত অশ্রু মুছিতে গিয়া তাহার মনে পড়িল—পিতার অশ্রু মুছাইয়া আসা হয় নাই। তাহার নিজের হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্রমাগত তাহার কাছে যেন কত নালিশ করিতে লাগিল। একে তাহার হৃদয় শত ব্যথায় বিদ্ধ, তাহার পর কোথায় কোন্ গ্রামান্তরে মন্দির হইতে যখন সন্ধ্যার শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তখন সেই আজন্ম পরিচিত আরতির আহ্বান-শব্দ তাহার কানের ভিতর দিয়া মর্মে নৈরাশ্যের হাহাকার বহন করিয়া আনিল। ছটফট করিয়া অপর্ণা শিবিকার দ্বার উন্মোচন করিয়া ফেলিল এবং সন্ধ্যার অন্ধকারের ভিতর দিয়া দেখিতে লাগিল এবং ছায়া-নিবিড় একটা উচ্চ দেবদারু-শিখায় একটা পরিচিত মন্দিরের সমুন্নত চূড়া কল্পনা করিয়া সে উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার শ্বশুর-বাটীর একজন দাসী পিছনেই চলিয়া আসিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কহিল, ছি বৌমা, অমন করে কি কাঁদতে আছে মা, শ্বশুর-ঘর কে না করে? অপর্ণা দুই হাতে মুখ চাপিয়া রোদন নিবারণ করিয়া পালকির কবাট বন্ধ করিয়া দিল।

ঠিক সেই সময়টিতেই মন্দিরের ভিতর দাঁড়াইয়া পিতা রাজনারায়ণ মদনমোহন ঠাকুরের পার্শ্বে ধূপধুনার ধূমে ও চক্ষুজলে অস্পষ্ট একখানি দেবী-মূর্তির অনিন্দ্যসুন্দর মুখে প্রিয়তমা দুহিতার মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

ছয়

অপর্ণা স্বামীগৃহে। সেথায় তাহার ইচ্ছাহীন স্বামী-সম্ভাষণের ভিতর এতটুকু আবেগ, এতটুকু চাঞ্চল্যও প্রকাশ পাইল না। প্রথম প্রণয়ের স্নিগ্ধ সঙ্কোচ, মিলনের সলজ্জ উত্তেজনা, কিছুই তাহার ম্লান চক্ষু দুটির পূর্বদীপ্তি ফিরাইয়া আনিল না। প্রথম হইতেই স্বামী ও স্ত্রী দুইজনেই যেন পরস্পরের কাছে কোন দুর্বোধ্য অপরাধে অপরাধী হইয়া রহিল, এবং তাহারই ক্ষুব্ধ বেদনা কুলপ্লাবিনী উচ্ছ্বসিতা তটিনীর ন্যায় একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নির্মাণ করিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন অনেক রাত্রে অমরনাথ ধীরে ধীরে ডাকিয়া কহিল, অপর্ণা তোমার এখানে থাকতে কি ভাল লাগে না?

অপর্ণা জাগিয়া ছিল, বলিল, না।

বাপের বাড়ি যাবে?

যাব।

কাল যেতে চাও?

চাই।

ক্ষুব্ধ অমরনাথ জবাব শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আর যদি যাওয়া না হয়?

অপর্ণা কহিল, তা হলে যেমন আছি তেমনি থাকব।

আবার কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করিয়া থাকিল, অমরনাথ ডাকিল, অপর্ণা!

অপর্ণা অন্যমনস্কভাবে বলিল, কি।

আমাকে কি তোমার কোন প্রয়োজন নাই?

অপর্ণা গায়ের কাপড়চোপড় সর্বাঙ্গে বেশ করিয়া টানিয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে শুইয়া বলিল, ও-সব কথায় বড় ঝগড়া হয়, ও-সব ব'লো না।

ঝগড়া হয়— কি করে জানলে?

জানি আমাদের বাপের বাড়িতে মেজদা ও মেজবৌ এই নিয়ে নিত্য কলহ করে। আমার ঝগড়া-কলহ ভাল লাগে।

শুনিয়া অমরনাথ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া সে যেন এই কথাটাই এতদিন খুঁজিতেছিল, হঠাৎ আজ যেন তাহা হাতে ঠেকিল, বলিয়া উঠিল, এস অপর্ণা, আমরাও ঝগড়া করি! এমন করে থাকার চেয়ে ঝগড়া-কলহ ঢের ভাল।

অপর্ণা স্থিরভাবে কহিল, ছি, ঝগড়া কেন করতে যাবে? তুমি ঘুমোও।

তাহার পর অপর্ণা ঘুমাইল কি জাগিয়া রহিল, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়াও অমরনাথ বুঝিতে পারিল না।

প্রত্যুষে উঠিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত দিন অপর্ণার কাজকর্ম ও জপেতপে কাটিয়া যায়। এতটুকু রঙ্গরস বা কৌতুকের মধ্যে সে প্রবেশ করে না, দেখিয়া তাহার সমবয়সীরা বিদ্রূপ করিয়া কত কি বলে, ননদেরা 'গোঁসাই ঠাকুর' বলিয়া পরিহাস করে, তথাপি সে দলে মিশিতে পারিল না। কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল, দিনগুলা মিছা কাটিয়া যাইতেছে। আর এই অলক্ষ্য আকর্ষণে তাহার প্রতি শোণিত-বিন্দু সেই পিতৃপ্রতিষ্ঠিত মন্দির-অভিমুখে ছুটিয়া যাইবার জন্য পূর্ণিমার উদ্বেলিত সিন্ধুবারির মত হৃদয়ের কূলে-উপকূলে অহরহ আছড়াইয়া পড়িতেছে,—তাহার সংযম কিসে হইবে? ঘরকন্নার কাজে, না ছোটখাট হাস্য পরিহাসে? ক্ষুব্ধ-অসুস্থচিত্ত তাহার এই যে বিপুল ভ্রান্তি মাথায় করিয়া আপনা-আপনি পাক খাইয়া মরিতেছে, তাহার নিকট স্বামীর অপর্ণা, তোমার জন্য কিছু উপহার এনেচি, দয়া করে নেবে কি?

অপর্ণা হাসিয়া বলিল, নেব বৈ কি?

অমরনাথ আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। আনন্দে শৌখিন রুমালে বাঁধা একটা বাক্সর ডালা খুলিতে বসিল। ডালার উপরে অপর্ণার নাম সোনার জলে লেখা। এখন একবার সে অপর্ণার মুখখানি দেখিবার জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু দেখিল, মানুষ কাচের নকল চোখ পরিয়া যেমন করিয়া চাহে, তেমনি করিয়া অপর্ণা তাহার পানে চাহিয়া আছে। দেখিয়া তাহার সমস্ত উৎসাহ একনিমেষে নিবিয়া গিয়া যেন অর্থহীন এক ফোঁটা শুষ্ক হাসির মাঝে আপনাকে লুকাইয়া ফেলিতে চাহিল। লজ্জায় মরিয়া গিয়াও সে বাক্সের ডালা খুলিয়া গোটা-কতক কুন্তলীনের শিশি, আরো কি কি বাহির করিতে উদ্যত হইল, অপর্ণা বাধা দিয়া কহিল, এনেচ কি আমার জন্য?

অমরনাথের হইয়া আর কে যেন জবাব দিল, হাঁ্যা, তোমার জন্যই এনেচি। দেলখোসগুলো—

অপর্ণা জিজ্ঞেসা করিল, বাক্সটাও কি আমাকে দিলে ?

নিশ্চয়ই।

তবে আর কেন মিছে ও-সব বের করবে, বাক্সতেই থাক।

তা থাক। তুমি ব্যবহার করবে ত ?

অকস্মাৎ অপর্ণা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। সমস্ত দুনিয়ার সহিত লড়াই করিয়া তাহার ক্ষতবিক্ষত হৃদয় পরাস্ত হইয়া বৈরাগ্য গ্রহণপূর্বক নিভৃতে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, সহসা,তাহার গায়ে এই স্নেহের অনুরোধ কুৎসিত বিদ্রূপের আঘাত করিল ; চঞ্চল হইয়া সে তৎক্ষণাৎ প্রতিঘাত করিল, বলিল নষ্ট হবে না, রেখে দাও। আমি ছাড়াও আরও অনেকে ব্যবহার করতে জানে। এবং উত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া অপর্ণা পূজার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। আর অমরনাথ,—বিহ্বলের মত সেই প্রত্যাখ্যাত উপহারের উপর হস্ত রাখিয়া সেই-ভাবেই বসিয়া রহিল। প্রথমে সে সহস্রবার মনে মনে আপনাকে নির্বোধ বলিয়া তিরস্কার করিল। বহুক্ষণ পরে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, অপর্ণা পাষাণী। তাহার চোখ জলে ভাসিয়া আসিল—সেইখানে বসিয়া একভাবে ক্রমাগত চক্ষু মুছিতে লাগিল। অপর্ণা তাহাকে যদি সুস্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিত, তাহা হইলে কথাটা অন্যরূপ দাঁড়াইতে পারিত। সে যে প্রত্যাখান না করিয়াও প্রত্যাখ্যানের সবটুকু জ্বালা তাহার গায়ে মাখাইয়া দিয়া গিয়াছে, ইহার প্রতিকার সে কি করিয়া করিবে ? অপর্ণাকে তাহার পূজার আসন হইতে টানিয়া আনিয়া, তাহারই সম্মুখে তাহার উপেক্ষিত উপহারটা নিজেই লাথি মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবে এবং সর্বসমক্ষে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিবে যে, সে তাহার মুখ আর দেখিবে না। সে কি করিবে, কত কি বলিবে, কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইবে, হয়ত ছাই মাখিয়া সন্ন্যাসী হইবে, হয়ত অপর্ণার কোন দারুণ দুর্দিনের দিনে অকস্মাৎ কোথাও হইতে আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে। এমনি সম্ভব, ও অসম্ভব কতরকম উত্তর-প্রত্যুত্তর, বাদ প্রতিবাদ তাহার অপমান পীড়িত মস্তিষ্কের ভিতর অধীরতার আলোড়ন সৃষ্টি করিতে লাগিল। ফলে কিন্তু সে তেমনি বসিয়া রহিল এবং তেমনি কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার এই আগাগোড়া বিশৃঙ্খল সঙ্কল্পের সুদীর্ঘ তালিকা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল না।

আট

তাহার পর দুইদিন দুই রাত্রি গত হইয়াছে, অমরনাথ ঘরে শুইতে আসে নাই। মা জানিতে পারিয়া বধূকে ডাকিয়া ঈষৎ ভৎর্সনা করিলেন, পুত্রকে ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিলেন; দিদিশাশুড়ী এই সূত্রে একটু রঙ্গ করিয়া লইলেন। এমনি সাতে পাঁচে ব্যাপাররটা লঘু হইয়া গেল।

রাত্রে অপর্ণা স্বামীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল, বলিল, যদি মনে কষ্ট দিয়ে দিয়ে থাকি ত আমাকে ক্ষমা কর।

অমরনাথ কথা কহিতে পারিল না। শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া বিছানার চাদর বার বার টানিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিল। সম্মুখেই অপর্ণা দাঁড়াইয়া, মুখে তাহার ম্লান হাসি। সে আবার কহিল, ক্ষমা করবে না?

অমরনাথ মুখ নীচু করিয়াই বলিল, ক্ষমা কিসের জন্য? ক্ষমা করবার অধিকারই বা আমার কি?

অপর্ণা স্বামীর দুই হাত আপনার হাতের ভিতর লইয়া বলিল, ও-কথা ব'লো না। তুমি স্বামী, তুমি রাগ করে থাকলে কি আমার চলে? তুমি ক্ষমা না করলে আমি দাঁড়াব কোথায়? কেন রাগ করেচ, বল?

অমরনাথ আর্দ্র হইয়া কহিল, রাগ ত করি নাই!

কর নাই ত?

না। অপর্ণা কলহ ভালবাসিত না; বিশ্বাস না করিয়াও বিশ্বাস করিল। কহিল, তাই ভাল। তাহার পর নিতান্ত নির্ভাবনায় বিছানার এক প্রান্তে শুইয়া পড়িল।

অমরনাথ কিন্তু ভারী আশ্চর্য হইয়া গেল। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া আর কেবলই সে মনে মনে তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল যে, এ কথা তাহার স্ত্রী বিশ্বাস করিল কি করিয়া! সে যে দু'দিন আসে নাই, দেখা করে নাই, তথাপি সে রাগ করে নাই—এটা কি বিশ্বাস করিবার কথা? এত কাণ্ড এত শীঘ্র মিটিয়া সব বৃথা হইয়া গেল? তাহার পর যখন সে বুঝিতে পারিল অপর্ণা সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন সে একেবারে উঠিয়া বসিল; এবং দ্বিধাশূন্য হইয়া জোর করিয়া ডাকিয়া ফেলিল, অপর্ণা, তুমি বুঝি ঘুমুচ্ছো? ও অপর্ণা।

অপর্ণা জাগিয়া উঠিল, বলিল, ডাকচ?

হ্যাঁ—কাল আমি কলকাতায় যাব।

কৈ, সে কথা ত আগে শুনি নাই! এত শীঘ্র তোমার কলেজের ছুটি

ফুরোল ? আরো দু'দিন থাকতে পার না ?

না ; আর থাকা হয় না।

অপর্ণা একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আমার উপর রাগ করে যাচ্চ ?

ইহা যে সত্য কথা অমরনাথ তাহা জানিত, কিন্তু সে-কথা সে স্বীকার করিতে পারিল না। সঙ্কোচ আসিয়া তাহার যেন কোঁচার খুঁট ধরিয়া টানিয়া ফিরাইল। আশঙ্কা হইল পাছে সে আপনার অপদার্থতা প্রতিপন্ন করিয়া অপর্ণার সম্ভ্রম হানি করিয়া বসে ; এমনি করিয়া কৌতূহল-বিমুখ নারীর নিশ্চেষ্টতা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। স্বামিত্বের যেটুকু তেজ সে তাহার স্বাভাবিক অধিকার হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, সেটুকু এই চার-পাঁচ মাস ধরিয়া দিনে দিনে অপর্ণা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে, এখন সে ক্রোধ প্রকাশ করিবে কোন্ সাহসে ?

অপর্ণা আবার বলিল, রাগ করে কোথাও যেয়ো না ! তা হলে আমার মনে বড় ব্যথা লাগবে।

অমরনাথ মিথ্যা ও সত্যে যাহা বানাইয়া বলিতে পারিল—তাহার অর্থ এই যে, সে রাগ করে নাই এবং তাহারই প্রমাণ-স্বরূপ সে আরো দুই দিন থাকিয়া যাইবে। থাকিলেও তাই। কিন্তু কাঁদিয়া জয়ী হইবার একটা লজ্জা-জনক অস্বস্তি লইয়া বাড়িতে থাকিল।

নয়

ঝাড়া বৃষ্টির একটা সুবিধা আছে—তাহাতে আকাশ নির্মল হয়। কিন্তু টিপিটিপি বৃষ্টিতে মেঘ কাটে না, শুধু পায়ের নীচে কাদা ও চতুর্দিকে নিরানন্দময় ভাব বাড়িয়া উঠে। বাড়ি হইতে যে কাদা মাখিয়া অমরনাথ কলিকাতায় আসিল, তাহা ধুইয়া ফেলিবার একটুখানি জলও বৃহৎ নগরীর ভিতর খুঁজিয়া পাইল না। এখানে তার পূর্বপরিচিত যে-সব সুখ ছিল, তাহাদের কাছে, এই পঙ্কিল পা দু'খানি বাহির করিতেও তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। না লাগে লেখাপড়ায় মন, না পায় আমোদ-আহ্লাদে তৃপ্তি। এখানেও থাকিতে ইচ্ছা করে না, বাড়ি যাইতেও প্রবৃত্তি নাই। সমস্ত বুকের উপর তাহার যেন দুর্বহ যন্ত্রণাভার চাপানো রহিয়াছে, এবং তাহা ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য ব্যাকুল বক্ষ-পঞ্জর পরস্পর ঠোকাঠুকি করিতেছে, কিন্তু বিফল চেষ্টা।

এমনি অন্তর্বেদনা লইয়া সে একদিন অসুখে পড়িল। সংবাদ পাইয়া পিতামাতা ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু অপর্ণাকে সঙ্গে আনিলেন না। অমরনাথও যে ঠিক এমনিটি আশা করিয়াছিল তাহা নয়, তবু দমিয়া গেল। অসুখ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এ সময়ে স্বভাবতঃই তাহার অপর্ণাকে দেখিতে ইচ্ছা করিত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিতে পারিল না, পিতামাতাও তাহা বুঝিলেন না! কেবল ঔষধ পথ্য আর ডাক্তার-বৈদ্য! অবশেষে সে তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল—অমরনাথ একদিন প্রাণত্যাগ করিল।

বিধবা হইয়া অপর্ণা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়া একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা তাহার মনে হইল, এ বুঝি তাহারই কামনার ফল! ইহাই বুঝি সে মনে মনে এতদিন চাহিতেছিল—অন্তর্যামী এতদিনে কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। বাহিরে শুনিতে পাইল যে, তাহার পিতা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছেন। এ কি সব স্বপ্ন? তিনি আসিলেন কখন? অপর্ণা জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সত্য সত্যই রাজনারায়ণবাবু বালকদের মত ধুলায় লুটিয়া কাঁদিতেছেন। পিতার দেখাদেখি সেও এবার ঘরের ভিতর লুটিয়া পড়িল ; অশ্রু-প্রবাহ মাটি ভিজাইয়া ফেলিল।

সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই, পিতা আসিয়া অপর্ণাকে বুকে তুলিয়া বলিলেন, মা! অপর্ণা!

অপর্ণা কাঁদিয়া বলিল, বাবা!

তোর মদনমোহন যে তোকে মন্দিরে ডেকেচে মা!

চল বাবা, যাই।

তোর যে সেখানে সব কাজ পড়ে আছে মা!

চল বাবা, বাড়ি যাই।

চল মা চল। পিতা স্নেহে মস্তক চুম্বন করিলেন, বুক দিয়া সর্ব দুঃখ মুছিয়া লইলেন এবং তাহার পর কন্যার হাত ধরিয়া পরদিন বাটি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া কহিলেন, ওই মা তোমার মন্দির! ওই তোমার মদনমোহন! নিরাভরণা অপর্ণার বৈধব্য-বেশে তাহাকে আর একরকম দেখিতে হইল। যেন এই সাদা বস্ত্র ও রুক্ষ কেশে তাহাকে অধিক মানাইল। সে তাহার পিতার কথা ভারী বিশ্বাস করিল, ভাবিল, দেবতার আহ্বানেই সে ফিরিয়া আসিয়াছে। ঠাকুরের মুখে যেন তাই হাসি, মন্দিরে যেন তাই শতগুণ সৌরভ। নিজে যেন সে এ পৃথিবীর অনেক উচ্চে এইরূপ

মনে হইল!

যে স্বামী নিজের মরণ দিয়া তাহাকে পৃথিবীর এত উচ্চে রাখিয়া গিয়াছেন, সেই মৃত স্বামীর উদ্দেশে শতবার প্রণাম করিয়া অপর্ণা তার অক্ষয়স্বর্গ কামনা করিল।

দশ

শক্তিনাথ একমনে ঠাকুর গড়িতেছিল। পূজা করার চেয়ে ঠাকুর তৈরি করিতে সে অধিক ভালবাসিত। কেমন রূপ, কেমন নাক, কান, চোখ হইবে, কোন্ রং বেশী মানাইবে, এই তাহার আলোচ্য বিষয়। কি দিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয়, কি মন্ত্র জপ করিতে হয়, এ-সব ছোট বিষয়ে তাহার লক্ষ্য ছিল না। দেবতার সম্পর্কে সে আপনাকে আপনি প্রমোশন দিয়া, সেবকের স্থান হইতে পিতার স্থানে উঠিয়া আসিয়াছিল। তবে তাহার পিতা তাহাকে আদেশ করিলেন, শক্তিনাথ, আজ আমার জ্বর বেড়েচে, জমিদার-বাটীতে গিয়া তুমি পূজা করে এস।

শক্তিনাথ বলিল, এখন ঠাকুর গড়চি।

বৃদ্ধ অসমর্থ পিতা রাগ করিয়া বলিলেন, ছেলেখেলা এখন থাক বাবা, কাজ সেরে এস।

পূজার মন্ত্র আবৃত্তি করিতে তাহার মোটে ইচ্ছা হইল না—তবু উঠিতে হইল। পিতার আদেশে স্নান করিয়া চাদর ও গামছা কাঁধে ফেলিয়া দেব-মন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহার পূর্বেও সে কয়েকবার এ মন্দিরে পূজা করিতে আসিয়াছে, কিন্তু এমন কাণ্ড কখন দেখে নাই। এত পুষ্প-গন্ধ, এত ধূপধুনার আড়ম্বর, ভোজ্য ও নৈবেদ্যের এত বাহুল্য। তার ভারী ভাবনা হইল, এত লইয়া সে কি করিবে? কিরূপে কাহার পূজা করিবে? সকলের চেয়ে সে অপর্ণাকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। এ কে, কোথা হইতে আসিয়াছে এতদিন কোথায় ছিল?

অপর্ণা কহিল, তুমি কি ভট্টাচার্যমশায়ের ছেলে?

শক্তিনাথ বলিল, হ্যাঁ।

তবে পা ধুয়ে পূজা করতে ব'স।

পূজা করিতে বসিয়া শক্তিনাথ আগাগোড়া ভুলিয়া গেল। একটা মন্ত্রও তাহার মনে পড়ে না। সেদিকে তাহার মনও নাই, বিশ্বাসও নাই, শুধু ভাবিতে লাগিল, এ কে, কেন এত রূপ, কিজন্য বসিয়া আছে ইত্যাদি। পূজার

পদ্ধতি ওলট-পালট হইতে লাগিল। কখনো ঘণ্টা বাজাইয়া, কখনও ফুল ফেলিয়া, নৈবেদ্যের উপর জল ছিটাইয়া এই অজ্ঞ নূতন পুরোহিতটি যে পূজার কেবল ভান করিতেছে মাত্র, বিজ্ঞ পরীক্ষকের মত পিছনে বসিয়া অপর্ণা সব বুঝিল। চিরদিন দেখিয়া দেখিয়া এ-সব ভাল করিয়াই জানে, শক্তিনাথ ফাঁকি দিবে কি করিয়া? পূজাবসানে কঠিনস্বরে অপর্ণা কহিল, তুমি বামুনের ছেলে, অথচ পূজা করতে জান না।

শক্তিনাথ বলিল, জানি।

ছাই জান!

শক্তিনাথ বিহ্বলের মত একবার তাহার মুখপানে চাহিল, তাহার পর চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। অপর্ণা ডাকিয়া ফিরাইয়া বলিল, ঠাকুর, এ-সব বেঁধে নিয়ে যাও—কিন্তু কাল আর এসো না। তোমার বাবা আরোগ্য হলে তিনি আসবেন। অপর্ণা নিজেই তাহার চাদর ও গামছায় সমস্ত বাঁধিয়া তাহাকে বিদায় করিল। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া শক্তিনাথ বার :বার শিহরিয়া উঠিল।

এদিকে অপর্ণা নূতন করিয়া পূজার আয়োজন করিয়া অন্য ব্রাহ্মণ ডাকিয়া পূজা শেষ করিল।

এগার

একমাস গত হইয়াছে। আচার্য যদুনাথ জমিদার রাজনারায়ণবাবুকে বুঝাইয়া বলিতেছেন, আপনি ত সমস্তই জানেন, বড় মন্দিরে মহৎ পূজা ভট্টাচার্যের ছেলের দ্বারা কিছুতেই সম্পন্ন হইতে পারে না।

রাজনারায়ণবাবু সায় দিয়া বলিলেন, অনেকদিন হ'ল অপর্ণাও ঠিক এই কথাই বলেছিল।

আচার্য মুখমণ্ডল আরো গম্ভীর করিয়া কহিলেন, তা ত হবেই। তিনি হলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা। তাঁর কি কিছু অগোচর আছে! জমিদারবাবুও ঠিক এই বিশ্বাস। আচার্য কহিতে লাগিলেন, পূজা আমিই করি আর যেই করুন ভাল লোক চাই। মধু ভট্টাচার্য যতদিন বেঁচেছিলেন, তিনিই পূজা করেচেন, এখন তাঁর পুত্রেরই পৌরোহিত্য করা উচিত, কিন্তু সেটা ত মানুষ নয়! কেবল পট আঁকতে পারে, পুতুল গড়তে জানে, পূজা-অর্চনার কিছুই জানে না।

রাজনারায়ণবাবু অনুমতি দিলেন, পূজা আপনি করবেন, তবে অপর্ণাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখব।

পিতার নিকট এ কথা শুনিয়া অপর্ণা মাথা নাড়িয়া বলিল, তাও কি হয়? বামুনের ছেলে, নিরাশ্রয়, কোথায় তাকে বিদায় করব? যেমন জানে তেমনই পূজা করবে। ঠাকুর তাতেই সন্তুষ্ট হবেন।

কন্যার কথায় পিতার চৈতন্য হইল—এতটা আমি ভেবে দেখি নাই। মা, তোমার মন্দির, তোমার পূজা, তোমার যা ইচ্ছা তাই ক'রো, যাকে ইচ্ছা ভার দিয়ো। এই কথা বলিয়া পিতা প্রস্থান করিলে।

অপর্ণা শক্তিনাথকে ডাকিয়া আনিয়া পূজার ভার দিল। বকুনি খাইয়া অবধি সে আর এদিকে আসে নাই: মধ্যে তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, সে সে নিজেও রুগ্ন। শুষ্কমুখে তাহার শোক-দুঃখের চিহ্ন দেখিয়া অপর্ণার মায়া হইল, কহিল, তুমি পূজো করো; যা জান তাই ক'রো, তাতেই ঠাকুর তৃপ্ত হবেন। এমন স্নেহের স্বর শুনিয়া তাহার সাহস হইল, সাবধান হইয়া মন দিয়া পূজা করিতে বসিল।

পূজা শেষ হইলে অপর্ণা নিজের হাতে সে যাহা খাইতে পারে রাঁধিয়া দিয়া বলিল, বেশ পূজা করেচ। বামুনঠাকুর, তুমি কি হাতে রেঁধে খাও?

কোনদিন রাঁধি, কোনদিন—যেদিন জ্বর হয়, সেদিন আর রাঁধতে পারি না।

তোমার কি কেউ নাই?

না।

শক্তিনাথ চলিয়া গেলে, অপর্ণা তাহার উদ্দেশে বলিল, আহা? দেবতার কাছে যুক্ত করে তাহার হইয়া প্রার্থনা করিল, ঠাকুর ইহার পূজায় তুমি সন্তুষ্ট হইয়ো, ছেলেমানুষের দোষ-অপরাধ লইও না। সেইদিন হইতে প্রতিদিন অপর্ণা দাসী দ্বারা সংবাদ লইত, সে কি খায়, কি করে, কি তাহার প্রয়োজন। নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ কুমারটিকে সে তাহার অজ্ঞাতসারে আশ্রয় দিয়া তাহার সমস্ত ভার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইল। এবং সেই সেইদিন হইতে এই কিশোর ও কিশোরী, তাহাদের ভক্তি-স্নেহ, ভুল-ভ্রান্তি সব এক একটি করিয়া এই মন্দিরটিকে আশ্রয়পূর্বক জীবনের বাকী কাজগুলিকে পর করিয়া দিল। শক্তিনাথ পূজা করে, অপর্ণা দেখাইয়া দেয়। শক্তিনাথ স্তব পাঠ করে, অপর্ণা মনে মনে তাহার সহজ অর্থ দেবতাকে বুঝাইয়া দেয়! শক্তিনাথ গন্ধ-পুষ্প হাত দিয়া তুলিয়া লয়, অপর্ণা অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া, বলে, বামুনঠাকুর, আজ এমনি করে

সিংহাসন সাজাও দেখি, বেশ দেখাবে। এমনি করিয়া এই বৃহৎ মন্দিরের বৃহৎ কাজ চলিতে লাগিল।

দেখিয়া শুনিয়া আচার্য কহিলেন, ছেলেখেলা হচ্ছে।

বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বলিলেন, যা করে হোক মেয়েটা নিজের অবস্থা ভুলে থাকলেই বাঁচি।

বার

থিয়েটারের স্টেজে যেমন পাহাড়-পর্বত, ঝড়-জল এক নিমেষে উড়িয়া গিয়া একটা মস্ত রাজপ্রাসাদ কোথা হইতে আসিয়া জোটে, আর লোকজনের সুখ-সম্পদের মাঝে দুঃখ-দৈন্যের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হয়, শক্তিনাথের জীবনেও যেন সেইরূপ হইয়াছে। সে জাগিয়াছিল, এখন ঘুমাইয়া সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছে, কিংবা নিদ্রায় দুঃখ-স্বপ্ন দেখিতেছিল, এখন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছে, প্রথমে তাহার ভাল ঠাহর হইত না। তথাপি এই দায়িত্বহীন দেবসেবার স্বর্ণ-শৃঙ্খল যে তাহার সর্বাঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়াছে এবং থাকিয়া ঝনঝন শব্দে বাজিয়া উঠিতেছে, ঐ বিক্ষিপ্ত পুতুলগুলা মাঝে মাঝে সে কথা তাহাকে স্মরণ করাইত, সে মৃত পিতার কথা মনে করিত, নিজের পূর্ব-স্বাধীনতার কথা ভাবিত; মনে হইত, সে যেন বিকাইয়া গিয়াছে, অপর্ণা তাহাকে কিনিয়াছে। অমনি অপর্ণার স্নেহ ক্রমে মোহের মত তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

অকস্মাৎ একদিন শক্তিনাথের মামাত ভাই আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার ভগিনীর বিবাহ। মামা কলিকাতায় থাকেন, সময় ভাল, কাজেই সুখের দিনে ভাগিনেয়কে মনে পড়িয়াছে। যাইতেই হইবে। কলিকাতা যাইবে—কথাটা শক্তিনাথের খুব ভাল লাগিল। সমস্ত রাত্রি সে দাদার নিকট বসিয়া কলিকাতার সুখের গল্প, শোভার কাহিনী, সমৃদ্ধির বিবরণ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। পরদিন মন্দিরে যাইতে তাহার ইচ্ছা হইল না। বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া অপর্ণা ডাকিয়া পাঠাইল। শক্তিনাথ গিয়া বলিল, আজ আমি কলকাতায় যাব—মামা ডেকে পাঠিয়েছেন—বলিয়াই সে একটু সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল।

অপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল, কবে ফিরে আসবে?

শক্তিনাথ ভয়ে ভয়ে বলিল, মামা বললেই চলে আসব।

অপর্ণা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। আবার সেই যদু আচার্য আসিয়া

পূজা করিতে বসিলেন। আবার তেমনি করিয়া অপর্ণা পূজা দেখিতে লাগিল, কিন্তু কোন কথা বলিবার আর তাহার প্রয়োজন হইল না, ইচ্ছাও ছিল না।

কলিকাতায় আসিয়া বিবিধ বৈচিত্র্যে শক্তিনাথের বেশ দিন কাটিলেও কয়েকদিন পরেই বাড়ির জন্য তাহার মন কেমন করিতে লাগিল। সুদীর্ঘ অলস দিনগুলো আর যেন কাটিতে চাহে না। রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, অপর্ণা যেন তাহাকে ক্রমাগত ডাকিতেছে, আর উত্তর না পাইয়া রাগ করিতেছে। একদিন সে মামাকে কহিল, আমি বাড়ি যাব।

মামা নিষেধ করিলেন—সে জঙ্গলে গিয়ে আর কি হবে? এইখান থেকে লেখাপড়া কর, আমি তোমার চাকরি করে দেবো।

শক্তিনাথ মাথা নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল।

মামা কহিলেন, তবে যাও।

বড়বৌ শক্তিনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো, কাল বুঝি বাড়ি যাবে?

শক্তিনাথ বলিল, হাঁ যাব।

অপর্ণার জন্য মন কেমন করচে নাকি?

শক্তিনাথ বলিল, হাঁ।

সে তোমাকে খুব যত্ন করে, নয়?

শক্তিনাথ মাথা নাড়িয়া কহিল, খুব যত্ন করে।

বড়বৌ মুখ টিপিয়া হাসিলেন; তিনি অপর্ণার কথা পূর্বেই শক্তিনাথের নিকট শুনিয়া লইয়াছিলেন, বলিলেন, তবে ঠাকুরপো এই দুটি জিনিস নিয়ে যাও; তাকে দিয়ো, সে আরো ভালোবাসবে। বলিয়া তিনি একটা শিশির ছিপি খুলিয়া খানিকটা দেলখোস শক্তিনাথের গায়ে ছড়াইয়া দিলেন। গন্ধে শক্তিনাথ পুলকিত হইয়া শিশি দুইটি চাদরে বাঁধিয়া লইয়া পরদিন বাটী ফিরিয়া আসিল।

তের

শক্তিনাথ মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে, পূজা শেষ হইয়াছে। চাদরে সেই শিশি দুইটি বাঁধা আছে—কিন্তু দিতে সাহস হইতেছে না, এই কয়দিনে অপর্ণা তাহার নিকট হইতে এত দূরে সরিয়া গিয়াছে। মুখ ফুটিয়া কিছুতে বলিতে পারিল না—তোমার জন্য সাধ করিয়া কলিকাতা হইতে ইহা

আনিয়াছি। সুগন্ধে তোমার দেবতাতৃপ্ত হন, তাই তুমিও হইবে। এইভাবে সাত-আটদিন কাটিল; নিত্য সে চাদরে বাঁধিয়া শিশি দুইটি লইয়া আসে, নিত্য ফিরাইয়া লইয়া যায়, আবার যত্ন করিয়া পরদিনের জন্য তুলিয়া রাখে। পূর্বেই মত একদিনও যদি অপর্ণা তাহাকে ডাকিয়া একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে হয়ত সে তাহাকে তাহা দিয়া ফেলিত, কিন্তু এ সুযোগ আর কিছুতেই হইল না। আর দুইদিন হইতে তাহার জ্বর হইতেছে, তবু ভয়ে ভয়ে সে মন্দিরে সজ্জা করিতে আসে। কি একটা অজানা আশঙ্কায় সে পীড়ার কথাটাও বলিতে পারে না। অপর্ণা কিন্তু সংবাদ লইয়া জানিত যে দুই দিন হইতে শক্তিনাথ কিছুই খায় নাই, অথচ সজ্জা করিতে আসিতেছে।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, তুমি দু'দিন হতে কিছু খাও নাই কেন?

শক্তিনাথ শুষ্কমুখে কহিল, আমার রাত্রে রোজ জ্বর হয়।

জ্বর হয়? তবে স্নান করে পূজা করতে এস কেন? এ কথা বল নাই কেন?

শক্তিনাথের চোখে জল আসিল। মুহূর্তে সব কথা ভুলিয়া গিয়া সে চাদর খুলিয়া শিশি দুইটি বাহির করিয়া বলিল, তোমার জন্য এনেচি।

আমার জন্য?

হাঁ, তুমি গন্ধ ভালবাস না?

উষ্ণ দুধ যেমন একটুখানি আগুনের তাপ পাইবামাত্র টগটগ করিয়া ফুটিয়া উঠে, অপর্ণার সর্বাঙ্গের রক্ত তেমনি করিয়া ফুটিয়া উঠিল—শিশি দুইটি দেখিয়াই সে চিনিয়াছিল; গম্ভীরস্বরে বলিল, দাও। হাতে লইয়া অপর্ণা মন্দিরের বাহিরে যেখানে পূজা করা ফুল শুকাইয়া পড়িয়া ছিল, সেইখানে শিশি দুইটি নিক্ষেপ করিল। আতঙ্কে শক্তিনাথের বুকের রক্ত জমাট বাঁধিয়া গেল। কঠিন-স্বরে অপর্ণা কহিল, বামুনঠাকুর, তোমার মনে এত। আর তুমি আমার সামনে এসো না, মন্দিরের ছায়াও মাড়িয়ো না। অপর্ণা চম্পকাঙ্গুলি দিয়া বহির্দেশ দেখাইয়া বলিল, যাও—

আজ তিন দিন হইল শক্তিনাথ গিয়াছে। আবার যদু আচার্য পূজা করিতে বসিয়াছেন, আবার ম্লানমুখে অপর্ণা চাহিয়া দেখিতেছে, এ যেন কাহার পূজা কে আসিয়া শেষ করিতেছে। পূজা সাঙ্গ করিয়া নৈবেদ্যের রাশি গামছায় বাঁধিতে বাঁধিতে আচার্য মহাশয় নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মারা গেল।

আচার্যের মুখপানে চাহিয়া অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, কে মারা গেল?

তুমি বুঝি শোন নাই? কয়দিনের জ্বরে শক্তিনাথ, ঐ মধু ভট্টাচার্যের ছেলে আজ সকালবেলা মারা পড়েচে।

অপর্ণা তবুও তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। আচার্য দ্বারের বাহিরে আসিয়া বলিলেন, পাপের ফলে আজকাল মৃত্যু হচ্ছে—দেবতার সঙ্গে কি তামাশা চলে মা!

আচার্য চলিয়া গেলেন। অপর্ণা দ্বার রুদ্ধ করিয়া মাটিতে মাথা ঠুকিয়া কাঁদিতে লাগিল; সহস্রবার কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল ঠাকুর এ কার পাপে?

বহুক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিল; চোখ মুছিয়া সে সেই শুষ্ক ফুলের ভিতর হইতে স্নেহের দান মাথায় করিয়া তুলিয়া লইল। মন্দিরের ভিতর আবার প্রবেশ করিয়া দেবতার পায়ের কাছে তাহা নামাইয়া দিয়া কাঁদিয়া কহিল, ঠাকুর, আমি যা নিতে পারি নাই—তা তুমি নাও! নিজের হাতে আমি কখনও তোমার পূজা করি নাই, আজ করচি—তুমি গ্রহণ কর, তৃপ্ত হও, আমার অন্য কামনা নাই।

সমাপ্ত